শিউলি-মালা

নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬০

মূল্য ২৲

১৬নং রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, হইতে শ্রীমতী প্রমিলা নজরুল ইসলাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ২৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, শ্যামসুন্দর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শিউলি মালা

-:*:-

পদ্ম-গোখরো

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখতে দেখতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কাণা-ঘুসা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্ব্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমীদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য, কিন্তু সে জমিদারী কয়েক বৎসরের মধ্যেই "ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল" অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্য্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্ত্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্ব্বে তেল মাখাইয়া

দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন!

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমন কি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটা ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্দ্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চই কোনো খান্দানী জমীদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ীর মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ীর বংশ-মর্য্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম ত নয়ই, বরং অনেক বেশী।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারি পাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অত রূপ, অমন বংশ-মর্য্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ী হইবে—ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে দরিদ্র মক্তব শিক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপ খ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা।

পিতার মন খুঁত্ খুঁত্ করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ-দৃষ্টির সময় ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদ্গদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভ'রে উঠ্‌বে।"

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের "পয়" বলিয়া কোনো জিনিস আছে কিনা জানিনা, কিন্তু জোহরার মীর বাড়ীতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয় রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীর বাড়ীর এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার

শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়ত বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জ্জনের মত একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলা বাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর শ্বাশুড়ী পর্য্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশী দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ও সাপটাকে মারিতেই হবে, নৈলে কথন্ বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বস্‌বে। ওর গর্জ্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চই জাত সাপ!" বলিয়াই বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধ-ধবল গোখ্‌রো সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দুর বর্ণ চক্র

বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন "মারিস্‌নে মারিস্‌নে, ও বাস্তু সাপ। দেখ্‌ছিস নে, ও যে পদ্ম-গোখ্‌রো।"

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখ্‌রোরূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চই কাঁসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।" আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "কই রে, সে রকম কোন শব্দ ত শুনি নি।"

আরিফ বলিল, "আমরা তো সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়ত শুন্‌তে পাইনি।"

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের চারিটা ইঁট সরাতেই দেখ্‌তে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চক্‌চক্‌ করিতেছে।

পিতা-পুত্রে তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন, তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায়।

একটী নাতিবৃহৎ পিতলের কলসী বাদশাহী আশরফীতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসী উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসী উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঐখানে!"

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল "না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চ'লে গেছে, আমি দেখেছি।"

কিন্তু এ সাপটা প্রথমেই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কল্‌সী ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখ্‌রো মারিতেও নাই।

কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখ্‌রো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটী দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসীর একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসী ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসী তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে আর কিছু করিল না। এক মনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্ম-গোখ্‌রো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল "ওই আগের সাপটা! এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে! আহা, দেখেছ কী রকম নীল হয়ে গেছে!"

আরিফ ও তাহার পিতা মাতা বিস্ময়ে জোহরার কীর্ত্তি দেখিতে-ছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিল।

কলসীতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কি করিবে, কোথায় রাখিবে—ভাবিয়া পাইল না।

শ্বশুর শাশুড়ী অশ্রুশিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, "সত্যিই মা, তোর সাথে মীর বাড়ীর লক্ষ্মী আবার ফিরে এল!"

কিন্তু এ সংবাদ এই চারিটী প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র মীরপরিবারের সহজ জীবন যাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্তু বধূর "পয়" দেখিয়াই বোধ হয়—আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মীর-বাড়ীর পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণ-রূপে সংস্কার হইল। বাড়ী-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কনট্রাক্টারী হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

কোন কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

এই অর্থ প্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্মগোখ্‌রো যুগলের প্রতি অরিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধ কলার লোভেই তাহারা পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর শ্বাশুড়ী স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্ব্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প—মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জ্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীর ভাবে বাড়ীর সর্ব্বত্র চলা-ফেরা করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ ত! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও একপ্রকার অসম্ভব! তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

জোহরা হয়ত রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্বাশুড়ি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ শ্বাশুড়ী খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটীতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জন

করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

ভয়ে শ্বাশুড়ীর পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটী এইবার যে উৎপাৎ আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্মগোখ্‌রোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির বাটীতে শয়ন করে।

জোহরা তিরস্কার করিলে ত্যহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মত তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনীদের মত নির্ব্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুইটী যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতি পটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে!

তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সমস্ত হৃদয় মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মত সে ঐ সর্প শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহ তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোন উপায়ও নাই। তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত-ফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ—তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না! রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার ত কোনো অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধ বশে বলিয়াছিল, "জোহরা তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এর চেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশী শান্তিময় ছিল।"

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রু-ভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে! বলে, ওরা আমার ছেলে! ওরা ত কোন ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না ত ওরা!"

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম!. আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না! এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশী সুখের হ'ত!

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে। ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছু দিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়ত সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে!

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, বহুদিন বাপের বাড়ী যাওনি, তোমার বাবাকে দু' তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এস!"

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটাকে কোথায়ও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতামাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণ-কান্তি স্বর্ণভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র্য পিতামাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু একদিন যাইতে না যাইতে পিতামাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্ব্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আঁড়ালে ডাকিয়া বলিলেন "হাঁরে, আরিফকে চিঠি লিখ্‌ব আসতে?

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, "না মা, উনি ত শনিবারেই আস্‌বেন!"

জামাই আসিল, তবু কন্যার চোখে মুখে পূর্ব্বের মত সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, "সত্যি বল্‌ত জোহরা, তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?"

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না মা! উনি ত আগের মতই আমায় ভালোবাসেন! বাড়ীতে আমার দুটী খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।"

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ীর প্রথা মত সেই সন্তান দুটীকে বাড়ীরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া এ কথা বলিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার

কেহ কোন কথা বলে না। জোহরার পিতা মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশী ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ, খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবারে আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, "বাবা! জোহরা ত একরকম খাওয়া দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে! ওর কি কোনো রোগ বেরামই হ'ল, তাও ত' বুঝতে পারছিনে—দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!"

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভাল বাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়ত সেই সাধনাই পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে!

ইহার মধ্যে সে বহুবার সুরলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দুটীকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই একদিনই তাহারা কি উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ীর কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

উদ্যত-ফণা আশী-বিষ! তবু সে কি তাহাদের কাতরতা মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা—একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়!

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও আত্মাভিমানে তাহাদের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোন রূপ উৎসুক প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, "বাবা, জান ত আমরা কত গরীব! মেয়ে ত শয্যা নিয়েছে! দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা ত দূরের কথা! মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছু দিনের জন্য ওকে কল্‌কাতায় বা বাড়ীতে নিয়ে যাও। তারপর ভাল হ'লে ওকে আবার রেখে যেয়ো!" বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামী কল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক—বোধ হয় স্ত্রীলোক জোহরার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে! ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; তাহার চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে!

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত! সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল, যেন সে অঘোর ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বেই আর একটী কামরা—স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা ষ্টীলের ট্রাঙ্কে জোহরার গহনা পত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা।

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনা পত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, "তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার, ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক্, তোমাকে ত চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিষ তোমার কাছে থাক্! আর তা ছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না।"

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেহ নয় সে তাহার শাশুড়ি—জোহরার মাতা!

দুদিন আগে ঝড়ে ঘরের কতকগু'লো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ী সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোঁটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে! তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিৎ এ পৃথিবী!

সে আর উচ্চ বাচ্য করিল্ না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল, তাহারা শাশুড়ির পিছু পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন পথে দেখিতে পাইল, ঐ ডাকাতও আর কেহ নয়—তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে অন্নের সংস্থান করিতে-ছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শ্বাশুড়ি তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

জোহরাও তাড়তাড়ি জাগিয়া উঠিয়া, বিস্ময়বিমূঢ়ার মত চাহিয়া রহিল।

আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার যে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।"

বলা বাহুল্য, এক মুহূর্ত্তে শ্বাশুড়ীর ক্রন্দন থামিয়া গেল! শ্বশুর—শ্বাশুড়ী দুই জনে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, "কে বাবা সে চোর? দেখেছ? সত্যিই দেখেছ তাকে?"

আরিফ্ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "জি হাঁ দেখেছি! কলিকাল কিনা, তাই সব কিছু উল্টে গেছে! যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ্ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল এবং ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে, হয়ত এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর আরিফ বলিল, "সে এখনি এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! এ নরক-পুরীতে সে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবে না।"

শ্বশুর-শাশুড়ী যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমন কি জোহরার মূর্চ্ছাও আরিফই ভাঙ্গাইল, পিতা-মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ্ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, "আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন. এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনো অপরাধ করিনি!"

আরিফ্ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজী হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দ্দেশ মত জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছু প্রশ্ন করিল না।

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাতে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্ততঃ সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়!

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এবাড়ীর বায়ুতেও যেন কিসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজী হইল, সে আজ দেখিবে—মানুষের ভণ্ডামীর সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ্ করিতে লাগিল, সে এবাড়ীতে আর জল স্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ্ ধরিল, না, সে খাইয়াই যাইবে!

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! সে মূর্চ্ছার পূর্ব্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটী কথা বলিয়াছিল—"রাক্ষুসী!"

আরিফের বুঝিতে বাকী রহিল না, সে কি খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না। এই মৃত্যুর ইতিহাস সে

তাহার পিতামাতাকে বলিয়া যাইবে। সে উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

ষ্টেশনে পৌছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিল। রক্ত বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টার চীৎকার করিতে করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবী পোষাক পরা বাঙ্গালী চেঁচাইয়া উঠিলেন. "এটা ফার্ষ্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও!"

আরিফ কোন কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙ্গালী সাহেবটী ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র বলিল, "আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার—"

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলের এক বড় জমিদার বাড়ীর "কলে" গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেণ্ট-কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া, তাহার সাহায্যে আরিফকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া নাড়ী পরিক্ষা করিয়া ইঞ্জেক্‌সন দিলেন। দুই তিনটা ইঞ্জেক্‌সন্ দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ী থামান নাই। কারণ গাড়ী কলিকাতায় পঁহুছিতে দেরী হইলে হয়ত এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পঁহুছিলে, ডাক্তার সাহেব এ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মত ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হউক!

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতা মাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়ীতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পাল্কি করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতা হাঁসপাতাল হইতে মোটর যোগে বাড়ী ফিরিয়াছে।

আশ্চর্য্য! সে বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু পিতা-মাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে, তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা ত মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে!

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত! সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না! বাহিরেও না, অন্তরেও না!

সে তখনও জানে না যে, আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে! আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারি প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, "একি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একি চেহারা হয়েছে তোর?

আরিফ শান্ত স্বরে বলিল, "কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।"

পিতা মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান-খয়রাৎ করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ীতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ীর দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কী থামিল।

জোহরা পাল্কী হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তুমি এসেছ—বেঁচে ফিরে এসেছ?"

বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোরা দু'জনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি?"

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, "আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে!"

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, "না, না, তুমি শাস্তি দাও! তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার!"

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, "এই নাও শাস্তি!"

দুঃখ বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখ্‌রোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে। কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে! সে সর্ব্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগ-রাজেশ্বরী!

বাড়ীতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখ্‌রোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, "মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি! আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে! একটু দুধ। মা! একটু দুধ! বড় ক্ষিদে!" "খোকা" "খোকা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী! সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী! তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মত সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর সম্মুখেই মীর পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটী ছোট্ট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটী ছোট্ট কবর, যেন দুটী যমজ ভাই—গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপন করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্ত বর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটী ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়েছে বাবা! খোকা!"

মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখ্‌রো যুগল!

জোহরা উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "খোকা আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়্‌ল?" জোহরা আবেগে সাপ দুইটীকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটীও মালার মত তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে!

জোহরা দেখিল পদ্ম-গোখ্‌রোষয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারে বারে জিভ বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—মা গো বড় ক্ষিদে! তুমি ত ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে!

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া-ভরা দুগ্ধ।

বাটীতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটা বুভুক্ষের মত বাটীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা।

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

খাশুড়ি উঠিয়া বধূর কীর্ত্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ও মা কি হবে, এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনি তুমি এসেছ, আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে।"

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!"

খাশুড়ি বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, "সত্যই ওরা তোমার খোকা বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু একদিন ওদের দুধ

দিয়েছিলাম। ওমা শুন্‌লে অবাক্‌ হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না। চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কত কি দেখব!"

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপান বশতঃই নির্জীবের মত বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল।

(৭)

সেইদিনই সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ীর একজন দাসী চীৎকার করিয়া উঠিল "ও মা গো, ভূতে ধরলে গো! জিনের বাদ্‌শা গো! জিন ভূত!"

বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়ীময় ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "হাঁরে বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা ত বলিস্ নি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।"

আরিফ বলিতেছিল, "কিন্তু এখন ত ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মেটেন্ত সাত মাস।"

এমন সময় বাড়ীময় শোর গোল উঠিল, "ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত!"

বাড়ীর চাকর-চাকরাণী সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে —জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ীর মধ্যে আম গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে!

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই ত কে যেন গাছ-তলায় প্রেতমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া!

তাঁহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে সাপে খেলে রে!"

জোহরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা তুমি!" আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ বেয়াই;"

জোহরা তখন চীৎকার করিতেছে, "ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মার! মেরে বের করে দাও!"

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেমন যষ্টিদ্বারা নির্দ্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চীৎকার করিতেছে—"ওরে বাপ্‌রে সাপে খেয়ে ফেল্‌লে! আমায় সাপে খেয়ে ফেললো!"

জোহরা উন্মাদিনীর মত তাহার শ্বাশুড়ীর হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল—"ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেল্‌লে! ওকে ধর! ওকে ধর!

জোহরার সাথে সাথে সকলে গিয়া আমগাছ তলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরারই পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখরোদ্বয় নির্ম্মম ভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্ম্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার "খোকা" এবং একবার "বাবা" বলিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেলে, সে

জিজ্ঞাসা করিল—"আমার খোকারা কই? আমার পদ্ম-গোখ্‌রো? আমার বাবা?"

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, "জোহরা! জোহরা! কেউ নেই! সব গেছে! সকলে গেছে। তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম গোখরোর কামড়ে!"

তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখিতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়ত তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরাণী দেখতে পেয়ে ভূত বলে চীৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখরো তাঁকে তাড়া করে!"

জোহরা হাঁপাইতে হাপাইতে বলিল "বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক্। আমার পদ্ম-গোখ্‌রো—আমার খোকারা কোথায় বল!"

আরিফ বলিল, "তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!"

জোহরা, "এ্যাঁ খোকারা নাই?" বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

জিনের বাদ্‌সা

ফরিদপুর জেলায় "আরিয়ল খাঁ" নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম। নাম মোহনপুর। অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী মুসলমান। গ্রামের একটেরে ঘরকতক কায়স্থ। যেন ছোঁয়াচের ভয়েই ওরা একটেরে গিয়ে ঘর তুলেছে।

তুর্কী ফেজের উপরের কালো ঝাণ্ডিটা যেমন হিন্দুত্বের টিকির সাথে আপোস করতে চায়, অথচ হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনি গ্রামের মুসলমানেরা কায়স্থ-পাড়ার সঙ্গে ভাব করতে গেলেও কায়স্থ পাড়া কিন্তু ওটাকে ভূতের বন্ধুত্বের মতই ভয় করে!

গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে চুন্নু ব্যাপারী মাতব্বর লোক। কিন্তু মাতব্বর হলেও সে নিজের হাতে চাষ করে। সাহায্য করে তার সাতটী ছেলে ও তিনটী বউ। কেন যে সে আর একটি বউ এনে সুন্নত আদায় করেনি, তা সেই জানে। লোকে কিন্তু বলে, তার তৃতীয় পক্ষটী একেবারে 'খরে-দজ্জাল' মেয়ে। এরই শতমুখী অস্ত্রের ভয়ে চতুর্থ পক্ষ নাকি ও-বাড়ী মুখো হ'তে পারেনি। এর জন্য চুন্নু ব্যাপারীর আফ্‌সোসের আর অন্ত ছিল না। সে প্রায়ই লোকের কাছে দুঃখ ক'রে বল্‌ত, "আরে এরেই কয়—খোদায় দেয় ত জোলায় দেয় না! আল্লা মিঞা ত হুকুমই দিছেন চারড্যা বিবি

আন্‌বার, তা কপালে নাই ওইবো কোহান্‌থ্যা !" বলেই একটু ঢোক গিলে আবার বলে, "ওই বিজাত্যার বেডিরে আল্লাই না এমন্‌ডা ওইলো !" ব'লেই আবার কিন্তু সাবধান ক'রে দেয়, "দেহিও বাপু, বারিত্‌ গিয়া কইয়্যা দিয়োনা। হে বেডি হুনল্যা একেরে হুপুর‍্যা মাতম লাগাইয়া দিবো !"

এই তৃতীয় পক্ষেরই তৃতীয় সন্তান "আল্লা-রাখা" আমাদের গল্পের নায়ক। গল্পের নায়কের মতই দুঃশীল, দুঃসাহসী, দুঁদে ছেলে সে। গ্রামে কিন্তু এর নাম "কেশরঞ্জন বাবু'। এ নাম এর প্রথম দেয় ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ে। নাম তার 'চান ভানু' অর্থাৎ চাঁদ বানু। সে কথা পরে বল্‌ছি।

চুনু ব্যাপারীর তৃতীয় পক্ষের দুই-দুইবার মেয়ে হবার পর তৃতীয় দফায় যখন পুত্র এল, তখন সাবধানী মা তার নাম রাখ্‌লে আল্লারাখা। আল্লাকে রাখ্‌তে দেওয়া হ'ল যে ছেলে, অন্ততঃ তার অকালমৃত্যু সম্বন্ধে —আর কেউ না হোক—মা তার নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। আল্লা হয়ত সেদিন প্রাণ ভরে হেসেছিলেন ! অমন বহু 'আল্লা রাখা'কে আল্লা 'গারস্থান-রাখা' করেছেন, কিন্তু এর বেলায় যেন রসিকতা করেই একে সত্যিসত্যিই জ্যান্ত রাখ্‌লেন। মনে মনে বললেন, "দাঁড়া, ওকে বাঁচিয়ে রাখ্‌ব, কিন্তু তোদের জ্বালিয়ে মেরে ছাড়্‌ব !" সে পরে মর্‌বে কিনা জানিনা, কিন্তু এই বিশ্‌টে বছর যে সে বেঁচে আছে, তার প্রমান গাঁয়ের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছে ! তার বেঁচে থাকাটা প্রমান করার বহর দেখে গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, ও গুয়োটা আল্লা রাখা না হয়ে যদি মাম্‌দোভূত

হ'ত, তা হ'লেও বরং ছিল ভাল! ভূতেও বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারেনা!

ওকে মুসলমান্‌রা বল্‌ত, "ইবলিশের পোলা," কায়েত্‌রা বল্‌তে, "অমাবস্যার জন্মিৎ!" বাপ বল্‌তে, "হালার পো," মা আদর করে বল্‌তে, —"আফ্‌লাতুন!"

এইবার যে মেয়েটীর কল্যাণে ওর নাম কেশরঞ্জন বাবু হয়, সেই চান ভানুর একটু পরিচয় দিই।

মেয়েটী ঐ গাঁয়েরই নারদ আলি শেখের। নারদ আলি নামটা হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাখা নয়। নারদ আলি অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগের মানুষ। অসহযোগ আন্দোলন যদ্দিনের, তা ওর হাঁটুর বয়েস! বাম পায়ের হাঁটু আর বল্‌লামনা, ওটা অতিরঞ্জন হবে!

নারদ আলি, শেখ রামচন্দ্র, সীতা বিবি প্রভৃতি নাম এখনো গাঁয়ে দশ-বিশটে পাওয়া যায়। অবশ্য, হনুমানুল্লা, বিষ্ণু হোসেন প্রভৃতি নামও আছে কিনা জানিনে!

নারদ আলি গাঁয়ের মাতব্বর না হ'লেও অবস্থা ওর মন্দ নয়। যা জমি-জায়গা আছে তার, ত্যারির উৎপন্ন ফসলে দিব্যি বছর কেটে যায়। ও কারুর ধারও ধারে না, কাউকে ধার দেয়ও না।

দিব্যি শান্ত শিষ্ট মানুষটী! কিন্তু ওর বউটী ঝগড়া-কাজিয়া না করলেও কাজিয়ার ভান ক'রে যে মজা করে, তা অন্ততঃ নারদ আলির কাছে

একটু অশান্তিকর ব'লেই মনে হয়। লোক ক্ষ্যাপানো বউটার স্বভাব। কিন্তু সে রসিকতা বুঝ্‌তে না পেরে অপর পক্ষ যখন ক্ষেপে ওঠে, তখন সে বেশ কিছুক্ষণ কোঁদল করার ভান ক'রে হঠাৎ মাঝে উঠানে ধামা চাপা দিয়ে ব'লে ওঠে, "আজ রইল কাজিয়া ধামা চাপা, খাইয়া লইয়া আই, তারপর তোরে দেখাইবো মজাডা! এই ধামারে যে খুল্‌বো, তার লল্লাটে আল্লা ভাসুরের সাথে নিকা লিখ্‌ছে!" বলেই এমন ভঙ্গির সাথে সে ধামাটা চাপা দেয় এবং কথাগুলো বলে যে, অন্য লোকের সাথে সাথে—যে ঝগড়া কর্‌ছিল সেও হেসে ফেলে! অবশ্য রাগ তাতে তার কমে না।

এদেরি একটি মাত্র সন্তান—চান্‌ভানু। পুঁথির কেস্‌সা শুনে মায়ের আদর ক'রে রাখা নাম!

চান্‌ভানু যেন তার মায়েরই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ! চোখে মুখে কথা কয়, ঘাটে মাঠে ছুটোছুটি করে, আরিয়ল খাঁর জল ওর ভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়!

চোদ্দ বছর বয়স হ'য়ে গেল, অথচ বাপে বল্‌লেও মায়ে বিয়ের নাম কর্‌তে দেয় না। বলে, চান চ'লে গেলে থাক্‌ব কি ক'রে আঁধার পুরীতে। নারদ আলি বেশী কিছু বল্‌লে বউ তার তাড়া দিয়ে ব'লে ওঠে, "তোমার খ্যাচ্‌খ্যাচাইবার ওইবোনা, আমার মাইয়্যা বিয়া বস্‌বনা—জৈগুন বিবির লাহান উয়ার হানিপ যদ্দিন না আয়ে!"

মোহনপুরের জৈগুন বিবি—চান ভানুর 'হানিফ' বীরের কিন্তু আসতে দেরী হ'ল না, এবং সে হানিফ আমাদের আল্লা-রাখা।

একদিন হঠাৎ আল্লা-রাখার 'সোনাভানের' পুঁথি পড়্‌তে পড়্‌তে মনে হ'ল, চান ভানুই সে সোনাভানবিবি এবং সে গাজী হানিফা। তার কারণ, চানের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ে ছিল না। সে সোনাভান বিজয়ের জন্ত জয়-জাত্রার চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে প'ড়ে যেতে লাগ্‌ল—

> "হানিফার আওয়াজ বিবি শুনিল যখন,
> নাশ্‌তা করিয়া নিল যোড়া আশী মণ।
> লক্ষ মনের গোর্জ্জ বিবির হাজার মনের ঢাল,
> বারো ঘোড়ায় চ'ড়ে বলে তুল্‌বো পিঠের খাল!"

বাপ্‌পুরে! এ যে হানিফার বাবা! এ আবার আশী মণ নাশ্‌তা করে, বারোটা ঘোড়ায় এক সাথে চড়ে! চান ভানুও ঐ রকম কিছু কর্‌বে নাকি? আল্লা-রাখা রীতিমত হক্‌চকিয়ে গেল। কিন্তু হেরে হেরেও ত হানিফাই শেষে কেল্লা-ফতে করেছিলেন! যা থাকে কপালে! আল্লা-রাখা তার বাব্‌রি চুলের মাঝে একটা এবং দু'দিকে দুটো—এই তিন তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, যায় জামায় বেশ ক'রে কেশরঞ্জন মেখে, গালে বেশ ক'রে পান ঠুসে সোনাভান ওর্ফে চান্‌ভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়্‌ল।

এইখানে ব'লে রাখি, আমাদের আল্লা-রাখা পুঁথি প'ড়ে যতদূর

আধুনিক হবার—তা হয়ে উঠেছিল। সে ঠিক চাষার ছেলের মত থাকত না, পরিষ্কার ধুতি-জামা-জুতো প'রে লম্বা চুলে তেড়ি কেটে, পাসিং সিগারেট খেতে খেতে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিত এবং কার কি অনিষ্ট করবে, তারি মতলব আঁটত। কিন্তু বয়স তার যৌবনের 'ফ্রন্টিয়ার' ক্রস্ করলেও মেয়েদের ওপর কোনো অত্যাচার কোনোদিন করেনি। তার টার্গেট্ ছিল বেশীর ভাগ বুড়োবুড়ীর দল; বাড়ীর মাঠের ফল-ফসল; গাছের আগা, ঘরের মটকা এবং রাত্রে বাঁশঝাড়, তেঁতুল গাছ, তাল গাছ ইত্যাদি।

অকারণে বলদ ঠ্যাঙানো বা তাদের দড়ি খুলে দিয়ে বাবাকে লোকের গা'ল খাওয়ানো ছাড়াবাবার চাষবাসে অন্য বিশেষ সহায়তা সে করেনি। দু'বার সে মাঠ তদারক কর্‌তে গেছিল, তাতে একবার মাঠের পাকাধানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, আর একবার সমস্ত ধান কেটে অন্যের ক্ষেতে রেখে এসেছিল! এরপর তার বাবা আর তাকে সাহায্য করতে ডাকেনি।

তার বিলাসিতার টাকা যখন তার মা একদিন বন্ধ কর্‌লে এবং বাবার কাছে চেয়েও তার বাবা যখন ওরই বদলে গড়পড়তা হিসেব ক'রে তার পৃষ্ঠে বেশ কিছু কো'ষে দিলে পাঁচনী দিয়ে, তখন সে বাড়ী থেকে পালিয়েও গেল না, কাঁদলেওনা, কারুর কাছে কোনো অনুযোগও কর্‌লে না। সেই দিন রাত্রে চুন্নু ব্যাপারির বাড়ীতে আগুন লেগে গেল। আল্লা-রাখা সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধূম্র উদ্গীরণ কর্‌তে কর্‌তে যা বলে উঠ্‌ল, তার মানে—আজ দিয়াশলাই কিনবার

পয়সা ছিলনা, ভাগ্যিস্ ঘরে তাদের আগুন লেগেছিল তাই সিগারেটটা ধরানো গেল।

তার বাবা তখন আল্লা-রাখাকে ধ'রে ধুমুর্শ-পেটা ক'রে পিটোতে লাগ্‌ল, সে তখন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে মা'র খেতে খেতে বল্‌তে লাগল, যে, সকালে মা'র খেয়ে বড্ডো পিঠ ব্যথা করাতেই ত সে পিঠে সেঁক নেবার জন্য ঘরে আগুন লাগিয়েছে! আজ আবার যদি পিঠ বেশী ব্যথা করে, পাড়ায় কারুর ঘরে আগুন লাগিয়েও ব্যথায় সেঁক দিতে হবে।

এই কবুল জবাব শুনে ওর বাবার যে টুকু মারবার হাত ছিল, তাও গেল ফুরিয়ে! সে ছেলের পায়ে মাথা কুট্‌তে কুট্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল, "তোর পায়ে পরি পোরা-কপাল্যা, হালারপো, ও-কম্মডা আর করিস্ না, হকেলেরে জেলে যাইবার আইবো যে!" যাক্, সেদিন গ্রামের লোকের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয়ে গেল যে, অন্ততঃ গ্রামের কল্যাণের জন্য ওর বাবা ওর বাবুয়ানার খরচটা চালাবে! আল্লা-রাখা গম্ভীর হয়ে সেদিন, বলেছিল, "আমি বাপ্‌কা বেটা, যা কইবাম, তা না কইর‍্যা ছারতম না! সকলে হেসে উঠ্‌ল, এবং যে বাপের বেটা সে সেই বাপ তখন ক্রোধে দুঃখে কেঁদে ফেলে ছেলেকে এক লাথিতে ভূমিসাৎ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"হুন্‌ছ নি হালারপোর কতা! হালারপো কয়, বাপ্‌কা বেডা! তোর বাপের মুহে মুতি!" এবার আল্লা-রাখাও হেসে ফেল্‌লে!

যাক্—যা বল্‌ছিলাম। ধোপ-দোরস্ত হয়ে আল্লা-রাখা অবলীলাক্রমে নারদ আলির উঠোনে গিয়ে ঠেলে উ'ঠে ডাকতে লাগল—"নারদ ফুফা, বারিত্ আছনি গো! এই চির পরিচিত গলার আওয়াজে বাড়ীর তিনটি

প্রাণী এক সাথে চ'ম্‌কে উঠ্‌ল! চানের মা ব'লে উঠল, "উই শয়তানের বাচ্চাডা আইছে!"

চান ভানু তখন দাওয়ায় ব'সে একরাশ পাকা করম্‌চা নিয়ে বেশ ক'রে নুন আর কাঁচালঙ্কা ড'লে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে টাক্‌রায় টোকার দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার কর্‌ছিল। সে তার টানা টানা চোখ দুটো বার দুয়েক পাকিয়ে আল্লা-রাখার তিন তেরিকাটা চুলের দিকে কটাক্ষ ক'রে বলে উঠল, "কেশ্‌রঞ্জন বাবু আইছেন গো, খাড়ুলিডা লইয়া আইও।" ব'লেই সুর ক'রে বলে উঠ্‌ল—

"এস কুড়ুম্‌ বইয়ো খাটে,
পা ধোও গ্যা নদীর ঘাটে,
পিঠ ভাঙবাম্‌ চেলা কাঠে!

ব'লেই হি হি ক'রে হেসে দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢু'কে পড়্‌ল!

আল্লা-রাখা এ অভিনব অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে রণে ভঙ্গ দিল। মোহনপুরের হানিফার এই প্রথম পরাজয়!

এ কথাটা চান ভানুর মায়ের মুখ হ'তে মুখান্তরে ফিরে গ্রামময়, রাষ্ট্র হয়ে গেল। এর পর থেকেই আল্লা-রাখাকে দেখ্‌লে, সকলে, বিশেষ ক'রে মেয়েরা ব'লে উঠ্‌ত—"উ-ই কেশ্‌রঞ্জন বাবু আইত্যাছেন!"

অপমান কর্‌লে চান ভানু এবং আল্লা-রাখা তার শোধ তুল্‌লে সারা গাঁয়ের লোকের উপর। আল্লা-রাখা পান, সিগারেট খাইয়ে গাঁয়ের কয়েকটি ছেলেকে তামিল দিয়ে দিয়ে প্রায় তৈরী ক'রে এনেছিল। তাদেরি সাহায্যে সে রাতে সে গ্রামের প্রায় সকল ঘরের দোরের সাম্‌নে যে সামগ্রী

পরিবেশন ক'রে এল, তা দেখলেই বমি আসে—শু'ক্‌লে ত কথাই নেই।

গ্রামের লোক বহু গবেষণাতেও স্থির ক'র্‌তে পার্‌লে না, অত কলেরার রুগী কোত্থেকে সে রাত্রে গ্রামে এসেছিল! তা'ছাড়া তেঁতুল পাতা খেয়ে যে মানুষের বদহজম হয়, এও তাদের জানা ছিল না। গো-বর, 'নর বর' ও পচানী ঘাটার সাথে গাঁদাল পাতার সংমিশ্রনের হেতু না হয় বোঝা গেল; কিন্তু ও মিকৃশচারের সাথে তেঁতুল পাতার সম্পর্ক কি? কিন্তু এ রহস্য ভেদ কর্‌তে তাদের দেরী হ'ল না, যখন তারা দেখ্‌লে—আর সব দ্রব্য অল্প আয়াসে উঠে গেলেও তেঁতুল পাতা কিছুতেই দোর ছেড়ে উঠতে চাইল না! বহু সাধ্য সাধনায় বিফলকাম হয়ে দোরের মাটী শুদ্ধ কুপিয়ে তু'লে যখন তিন্তিড়ি-পত্রের হাত এড়ানো গেল, তখন সকলে একবাক্যে বল্‌লে—না; ছেলের বুদ্ধি আছে বটে! তেঁতুল-পাতার যে এত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তা সে দিন প্রথম গ্রাকের লোক অবগত হ'ল!

সারাগ্রামে মাত্র একটী বাড়ী সেদিন এই অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেল। সে চান ভানুদের বাড়ী। নিজের বাড়ীকেও যে রেহাই দেয়নি, স্রে-যে কেন বিশেষ ক'রে চান্‌ ভানুরই বাড়ীকে—যার ওপর আক্রোশে ওর এই অপকর্ম্ম—উপেক্ষা কর্‌লে, এর অর্থ বুঝ্‌তে অন্ততঃ চান্‌ ভানুর আর তার মা-র বাকী রইল না!

সে যেন বল্‌তে চায়—দেখ্‌লে ত আমার প্রতাপ! ইচ্ছে কর্‌লেই তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারতাম, কিন্তু নিলামনা! তোমাকে ক্ষমা করলাম!

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে পরদিন সকালে চান ভানু হঠাৎ কেঁদে ফেললে! ক্রোধে অপমানে তার শুক্লপক্ষের চাঁদের মত মুখ—কৃষ্ণপক্ষের উদয়-মুহূর্ত্তের চাঁদের মত রক্তাভ হয়ে উঠ্‌ল! তার মা মেয়েকে কাঁদতে দেখে অস্থির হয়ে বলে উঠ্‌ল, "চান, কাঁদ্‌ছিস কিয়ের ল্যাইগ্যা রে! তোর বাপে বক্‌ছে?" চান্‌ ভানু বাপ মায়ের একটী মাত্র সন্তান ব'লে যেমন আদুরে, তেমনি অভিমানী। তার মা মনে কর্‌লে, ওর বাবা মাঠে যাবার আগে মেয়েকে কোনো কারণে ব'কে গেছে।

চান্‌ আরো কেঁদে উ'ঠে যা ব'লে উঠ্‌ল তার মানে—কেন আল্লা-রাখা তাদের এ অপমান কর্‌বে! সকলের বাড়ীতে অপকর্ম্মের কীর্ত্তি রেখে ওদেরে দিয়েও গ্রামবাসীকে জানাতে চায় সে ওদের উপেক্ষা করে—ক্ষমাই ওরা! এর চেয়ে ওর অপমান যে ঢের ভালো ছিল।

মা মেয়েকে অনেকক্ষণ ধ'রে বুঝালে। কাল অমন ক'রে ওকে অভ্যর্থনা করার দরুণই যে সে এসব করেছে তাও বল্‌লে। চান্‌ ভানুর মন কিন্তু কিছুতেই আর প্রসন্ন হয়ে উঠল্‌ না। আল্লা-রাখা কাঁটার মত তার মনে এসে বিঁধতে লাগল।

আল্লা-রাখা হানিফার মতই তীরন্দাজ। তার প্রথম তীর ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে!

সেদিন দুপুরে যখন চান্‌ ভানু আরিয়লখাঁতে স্নান কর্‌তে যাচ্ছিল, তখন তার ম্লান মুখ দেখে আল্লা-রাখা যেমন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠ্‌ল, তেম্‌নি তার বুকে কাঁটার মত কি একটা ব্যথা যেন খচ ক'রে উঠল। আহা! ওর মুখ মলিন! নাঃ, চান ভানুও সোনাভানের মতই তীর ছুড়তে জানে! তারও অলক্ষ্য লক্ষ্য ঠিক জায়গায় এসে বিঁধল!

আল্লা-রাখার চোখে চোখে পড়তেই ম্লানমুখী চান্ ভানুর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। এ হাসির জন্য সে একবারে প্রস্তুত ছিল না! এত বড় শয়তানের এমন চুনিবিল্লির মত মুখ! এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়!

কিন্তু হেসেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এ হাসির যদি আল্ল-রাখা অন্য মানে ক'রে বসে! ছি ছি ছি ছি!

কিন্তু চান্ ভানুকে এ লজ্জার দায় বেশীক্ষণ পোহাতে হ'ল না। ওর হাসির ছুরি একটু চিক্‌চিকিয়ে উঠতেই আল্লা-রাখা রণে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। সে মনে করলে, এ হাসির বিজলীর পরেই বুঝি ভীষণ বজ্রপাত হবে! চান্ দেখতে পেল, অদূরে একটা বিরাট বহুকালের পুরাণো অশ্বথ গাছে আল্লা-রাখা তর তর ক'রে উ'ঠে একবারে আগডালে গিয়ে বসল। কি ভীষণ ছেলে বাবা! ও গাছে যে সাপ আছে সবাই বলে! যদি সাপে কামড়ে দেয়, যদি ডাল ভেঙ্গে পড়ে যায়! চান্ ভানু খানিক দাঁড়িয়ে ওর কীর্ত্তি-কলাপ দেখে এই ভাবতে ভাবতে নদীর জলে স্নান করতে লাগল।

নদীতে নেমেই তার মনে হ'ল, ছি ছি, সে করেছে কি! কেন সে ঐ বাঁদরটাকে অতক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে! ও যে আস্কারা পেয়ে মাথায় চ'ড়ে বস্‌বে! না জানি সে এতক্ষণ কি মনে কর্‌ছে।

তার আর সে দিন সাঁতার কাটা হ'লনা। আরিয়লখাঁর জল আজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! চান্ ভানু চুপ ক'রে গলা-জলে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত আজ তার এই প্রশ্নই মনে বারে বারে

উদয় হয়েছে—কেন আল্লা-রাখা ওদের বাড়ী কা'ল অমন ক'রে গিয়েছিল ! ও ত কারুর বাড়ীর ভিতরে সহজে যায়না। কেন সে ওকে দেখে অমন করে তাকিয়ে ছিল। তারপর সারা গাঁয়ের লোকের উপর অত্যাচার ক'রে কেনই বা তার অপমানের প্রতিশোধ নিলে, ওকেই যা কিছু বল্লেনা কেন ! ও শুধু বাঁদর নয়, ও বুঝি পাগলও !

ভাব্তে ভাব্তে হঠাৎ তার মনে হল, সে বুঝি অশথ গাছ থেকে তাকে দেখ্ছে। অনেকটা দূরে অশ্বত্থ গাছটা। তবু সে স্পষ্ট দেখ্তে পেল, অশথ গাছটার ওধারের ডাল থেকে কখন্ সে এ ধারের ডালে এসে ওরির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কি বালাই ! চান্ ভানুর মনে হতে লাগ্ল, ও বুঝি আর কিছুতেই জল ছেড়ে উঠতে পারবে না। ওকে ত আরও কতবার দেখেছে, ওরই সাম্নে সাঁত্রেওছে এই নদীতে ; কিন্তু এ লজ্জা—এ সঙ্কোচ ত ছিলনা ওর। কি কুক্ষণে কাল-সন্ধ্যায় সে ওদের বাড়ীতে পা দিয়েছিল ! ও যেন কাল্বৈশাখীর মেঘের মত, যত ভয় করে, তত দেখ্তেও ইচ্ছে করে !

এবারেও তাকে আল্লা-রাখা মুক্তি দিল। চান্ ভানু দেখলে, আল্লা-রাখা গাছ থেকে নেমে যাচ্ছে।

এইবার তার ভীষণ রাগ হল ঐ হতচ্ছাড়ার উপর। সে মনে করে কি ! সে কি মনে করে, সে গাছে বসে থাকলে ও স্নান করে উঠে যেতে পারেনা ? তাই সে দয়া করে নেমে গেল ! ও কি মনে করেছিল,

পথে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চান্‌ ভানু আর নদীতে যেতেই পারবেনা, ভয়ে লজ্জায়? তাই সে পথ ছেড়ে চলে গেছিল? চান্‌ নিস্ফল আক্রোশে ফুল্‌তে লাগল। আজ সে দেখিয়ে দেবে যে, যত বড় শয়তান হোক সে, তাকে চান্‌ ভানু থোড়াই কেয়ার করে! জলের মধ্যেও তার শরীর যেন জ্বল্‌তে লাগল! তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে উঠে সে জোরে জোরে পথ চলতে লাগল। এবার যদি পথে দেখা পায় তার, তা হ'লে দেখিয়ে দেবে কেমন ক'রে ওর নাকের তলা দিয়ে চান্‌ হন্‌হনিয়ে চলে যেতে পারে! ওকে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না!

কিন্তু কোথাও কেশরঞ্জন বাবুর কেশাগ্রও সে দেখতে পেলনা! এবারেও সেই অপমান, সেই দয়া? ওকে চান ঘৃণা করে—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে! কিন্তু এ কি, ওকে একটু অপমান কর্‌তে পারলনা বলেই কি মনটা এমন হঠাৎ মলিন হয়ে উঠল? ওকে পথে দেখতে পেলনা বলে মনটা ক্রমে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল কেন? যে জোরে সে নদী থেকে আসছিল, পায়ের সে জোর গেল কোথায়? এ কি হ'ল আজ চানের? ওর ঘাড়ে কি তবে ভূত চাপ্‌ল?

পঞ্চশরের ঠাকুরটার শরে কেউটে সাপের মতই হয়ত তীব্র বিষ মাখানো থাকে। শর বিঁধবা মাত্র ও বিষ সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর ছেয়ে মাথায় গিয়ে ওঠে! নৈলে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চানের অবস্থা এমন সঙীন হয়ে উঠত না! ওকে ভুল্‌তেও পারে না, মনে করতেও শরীর রাগের জ্বালায় তপ্ত হয়ে ওঠে!

আজ প্রথম চান্ ভান্থুর আহারে অরুচি হ'ল। মা প্রমাদ গুণ্‌লে। আইবুড়ো মেয়ে বেশী বড় হ'লে কেন যে ভূতগ্রস্ত হয়—মা যেন আজ তা বুঝতে পারল। গোপনে চোখ মুছে মনে মনে বল্‌লে, ভূতে নজর দিয়েছে মা—আর তোকে রাখা যাবে না, এইবার তোর মায়া কাটাতে হবে!

নারদ আলি আশ্চর্য্য হয়ে গেল, যখন তার বউ মেয়ের পাত্র-সন্ধানের জন্য বল্‌ল তাকে। কোনো কথা হ'ল না, দুই জনারই চোখে জল গড়িয়ে পড়্‌ল।

(২)

চান্ ভানুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। আর মাসখানেক মাত্র বাকী। পাশের গাঁয়ের ছেরাজ হাল্দারের ছেলের সাথে বিয়ে।

মোহনপুরের হানিফা, আমাদের আল্লা-রাখা চান্ ভানুর কেশরঞ্জন বাবু—এ সংবাদে একেবারে 'মরিয়া হইয়া' উঠ্ল। ইস্পার কি উস্পার ! তার চান্ ভানুকে চাই-ই চাই ! সে জান্ত, চান্ ভানুর বাপ-মা কিছুতেই তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কাজেই বিয়ের প্রস্তাব করা নিরর্থক। তার মাথায় তখন জৈগুন সোনাভানের কাহিনী দুর্দ্দম ঘুরপাক খাচ্ছে। সে চান্ ভানুকে হরণ ক'রে দেশান্তরী হয়ে যাবে ! কিন্তু ওপথের একটা মুশ্কিল এই যে, ওতে চান্ ভানুর সম্মতি থাকার দরকার। কি করে ওর সম্মতি নেওয়া যায় ?

দেখ্তে দেখ্তে দশটা দিন কেটে গেল, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘট্ল না। এবার দিনের দিন আল্লা আল্লা-রাখার পানে যেন মুখ তু'লে চাইলেন !

এর মধ্যে কতদিন দেখা হয়েছে চান্ ভানুর সাথে তার, কিন্তু কিছুতেই একবারের বেশী দুবার ওর চোখের দিকে সে তাকাতে পারেনি। যার ভয়ে সারাগ্রাম থরহরি কম্পমান, তার কেন এত ভয়

করে এইটুকু মেয়েকে—আল্লা-রাখা ভেবে তার কূল কিনারা পায় না। কিন্তু আর ত সময় নাই, আর ত লজ্জা কর্‌লে চলে না। কত মতলবই সে ঠাউরালে। কিন্তু কিছুতেই কোনোটা কাজে লাগাবার সুযোগ পেলে না।

আজ বুঝি আল্লা মুখ তুলে চাইলেন! সেদিন সন্ধ্যায় চান্‌ ভানু যখন জল নিতে গেল নদীতে, তখন নদীর ঘাট জনমানবশূন্য।

চান্‌ ভানু নদীর জলে যেই ঘড়া ডুবিয়েছে—অম্‌নি একটু দূরে ভুস ক'রে একটা জল—দানোর মুখ মাসসার মত ভেসে উঠল এবং সেই মুখ থেকে আনুনাসিক স্বরে শব্দ বেরিয়ে এল—'তুই যদি আল্লা-রাখারে ছাইর‍্যা আর কারেও সাদি করিস, হেই রাত্রেই তোদের খাড় মট্‌কাইয়া আমি রক্ত খাইয়া আসমু!" চান্‌ ভানু ঐ স্বর এবং ঐ ভীষণ মুখ দেখে একবার মাত্র "মা গো" ব'লে জলেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল! এই শুভ অবসর মনে ক'রে জলদানো নদী হ'তে উ'ঠে এল এবং তার মাথা থেকে নানা রঙের বিচিত্র মালসাটা খু'লে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে চান ভানুকে কোলে ক'রে ডাঙায় তুলে আন্‌লে। এ জলদানো আর কেউ নয়, এ আমাদের সেই বিচিত্র-বুদ্ধি আল্লা-রাখা ওর্ফে কেশরঞ্জন বাবু।

মিনিট কয়েকের মধ্যে চান্‌ভানুর চৈতন্য হ'ল। চৈতন্য হ'তেই সে নিজেকে আল্লা-রাখার কোলে দেখে—লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উ'ঠে বল্‌ল, "তুমি কোহান থ্যা আইলে!" ঝড়্‌বার সময় বাঁশ-পাতা যেমন ক'রে কাঁপে, তেমনই ক'রে সে কাঁপতে লাগল। আল্লা-রাখা

বল্‌লে, 'এই দিক দিয়া যাইতে ছিলাম, দেহি কেডা জলে ভাস্‌তে আছে, দেইহ্যা ছুড্যা জলে ফাল দিয়া পাব্‌লাম, তুইল্যা দেহি তুমি! আল্লারে আল্লা, খোদায় আনছিল্‌ আমারে এই পথে, নইলে কি অইত! কি অইছিল্‌ তোমার?"

দু'চোখ ভরা কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিয়ে চান্‌ভানু আল্লা-রাখার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর জলদানোর বাণীগুলি বাদ দিয়ে বাকী সব ঘটনা বল্‌লে।...

আল্লা-রাখা যখন চান্‌ভানুকে নিয়ে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সব কথা বললে—তখন তাদের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে' গেল। চান্‌ভানুর বাপ মা কাঁদতে কাঁদ্‌তে প্রাণ ভ'রে আল্লা-রাখাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ল। আল্লা-রাখা তার উত্তরে শুধু চান্‌ভানুর দিকে তাকিয়ে হেসে বল্‌লে, "কেমন! তোমার কেশরঞ্জন বাবুর পিঠ ভাঙ্‌বা নি চেলা কাঠ দিয়া?"

আজ হঠাৎ যেন খুশীর তুফান উথলে উঠেছিল চান্‌ভানুর মনে। এই খুশীর মুখে হঠাৎ তার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, "খোদায় যদি হেই দিন দেয়, ভাঙ্‌বাম পিঠ!" ব'লেই কিন্তু লজ্জায় তার মাটির ভিতরে মুখ লুকিয়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগল। ও কথার অর্থ ত আল্লা-রাখার কাছে অবোধ্য নয়! কিন্তু সে দিন ত খোদা দেবেন না। কুড়ি দিন পরে যে সে হালদার বাড়ীর বৌ হয়ে চলে যাচ্ছে! এ কি কর্‌ল সে! সে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই বিছানায় মুখ গুজে শুয়ে পড়ল! তার কেবলি ডুক্‌'রে ডুক্‌'রে কান্না পেতে লাগ্‌ল!

আল্লা-রাখাও সেই মুহূর্ত্তে উধাও হয়ে গেল। চান্‌ভানুর বাপ মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ কি হ'ল! কী এর মানে?

আল্লা-রাখা আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে নদীর ধারে ছুটে গেল। তখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশের সীমানা আলো ক'রে। আল্লা-রাখার মনে হ'ল—ও চাঁদ নয়, ও চান্‌ভানু ওরই মনের আকাশ আলো ক'রে উঠেছে আজ সে।

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নদীর ধারে ব'সে ব'সে তারস্বরে চীৎকার ক'রে সে গান কর্‌লে। তারপর বাড়ী ফিরে সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল,—শুধু জল-দানোর কথা নয়, জল-দানো যা যা বলেছে, সে কথাগুলোও চান্‌ নিশ্চয় তার বাপ-মাকে বলেছে। কা'লই হয়ত ও সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে ওর বাপ মা আমাদের বাড়ীতে এসে বিয়ের কথা পাড়বে। আর তা যদি না করে, নদীতে যদি আর না যায়, ডাঙার ভূত ত বেঁচে আছে।

কিন্তু আরও দুটো দিন পেরিয়ে গেলেও যখন সেরকম কোনো কিছু ঘটল না, তখন আল্লা-রাখার বুঝতে বাকী রইল না যে, চান্‌-ভানু লজ্জায় বা কোনো কারণে জল-দানোর উপদেশগুলো তার বাপ মাকে জানায়নি। তা হ'লে ওর বাপ-মা অমন নিশ্চিন্ত হয়ে উঠোনে বিয়ের ছান্‌লা তুল্‌তে পারত না। বিফলতার আক্রোশে ক্রোধে সে পাগলের মত হয়ে উঠল। আর দেরী কর্‌লে সব হারাবে সে, এইবার ভূতেদের মুখ দিয়ে সোজা ওর বাপ মাকেই সব কথা জানাতে হবে!

সে দিন গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত রকম কান্নার শব্দে নারদ আলিদের ঘুম ভেঙে গেল! মনে হ'ল—ওদেরি উঠোনে ব'সে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। নারদ আলি মনে করলে, আজও বুঝি পাশের বাড়ীর সোভান তার বৌকে ধরে ঠেঙিয়েছে। সেই বৌটা ওদের বাড়ী এসে কাঁদছে! তবু সে একবার জিজ্ঞাসা করলে—"কেডা কাঁদে গো, বদ্‌নার মা নাকি?" কোনো উত্তর এল না। তেমনি কান্না

কেরোসিনের ডিবাটা হাতে নিয়ে নারদ আলি বাইরে বেরিয়েই "আল্লাগো" বলে, চীৎকার করে, ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিল! চানের মা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো, কি অইলো! কেডা?" নারদ আলি আর উত্তর না দিয়া, ১০৫ ডিগ্রি জ্বরের ম্যালেরিয়া রুগীর মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কেবল "কুলহুআল্লাহ্‌" প'ড়ে বুকে ফুঁ দিতে লাগ্‌ল! তার মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত তখন ভয়ে সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে! যত হি-হি-হি-হি করে, তত "তৌবা-আস্তগ্‌ফার" পড়ে, তত সে আল্লার নাম নিতে যায়,—কিন্তু আল্লার 'ল' পর্য্যন্ত এসে ভয়ে জিভে জড়িয়ে যায়।

চান ভান্নুর ততক্ষণে ঘুম ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু ভূতের নাম শুনে সে বিছানা কামড়ে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে প'ড়ে আছে!

অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নারদ আলি বল্‌তে লাগল, —"আল্লারে আল্লা! (নাকে কানে হাত দিয়ে) তৌবা আস্তগ্‌ফারুল্লা! তৌবা তৌবা! আউজবিল্লা (নাউজবিল্লা নয়!) বিসমিল্লা!

আরে আমি বারা'ইয়া দেহি তাল গাছের লাহান একডা বুইর‍্যা মাথায় পগ্‌গ বাঁইন্দ্যা খারাইয়া আছে! দশ হাত লম্বা তার দারি! আল্লারে আল্লা! ও জিনের বাদশা আইছিল আমাগো বারিত্‌!

শুনে চান্‌ এবং তার মা দুই জনেরই ভির্মি লাগাবার মত হ'ল। উক্ত তালগাছ-প্রমাণ লম্বা বৃদ্ধ জিনের বাদশা তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে কিনা, তা দেখবারও সাহস হ'ল না কারুর। পাড়ার কাউকে চীৎকার ক'রে ডাকবার মত স্বরও কণ্ঠে অবশিষ্ট ছিলনা। গলা যেন কে চেপে ধরেছে ওদের! তার ওপরে লোক ডাক্‌লে যদি জিনের বাদশা চ'টে যায়! ওরে বাপরে, তা হ'লে আর রক্ষে আছে! তিন জনে বাতি জ্বালিয়ে ব'সে ব'সে কাঁপ্‌তে কাঁপতে আল্লার নাম জপতে লাগল।

জিনের বাদ্‌শা সে-রাত্রে আর কোনো উপদ্রব কর্‌লে না। আস্তে আস্তে জিনের বাদ্‌শা সামনের আম বাগানে ঢুকে ইশারা করতেই তিন চারিটী বিচিত্র আকৃতির ভূত বেরিয়ে এল। তারা জিনের বাদ্‌শার বেশ-বাস খু'লে নিতে লাগল। সে বেশ এইরূপ ছিল!—

প্রকাণ্ড দীর্ঘ একটা বাঁশের সাথে স্বল্প দীর্ঘ আর একটা বাঁশ আড়াআড়ি ক'রে বাঁধা, দীর্ঘ বাঁশটার আগায় একটা মাল্‌সা বসিয়ে দেওয়া; সে মাল্‌সায় নানারকম কালি দিয়ে বিভৎস রকম একটা মুখ আঁকা, সেই মালসার ওপর একটা বিরাট পাগড়ি বাঁধা। মালসার মুখে পাট দিয়া তৈরী য়্যা লম্বা দাড়ী ঝুলানো, আড়াআড়ি বাঁশটা যেন ওর হাত, সেই হাতে দুটো কাপড় পিরানের ঝোলা হাতার মত ক'রে বেঁধে দেওয়া;

লম্বা বাঁশটার দুই দিকে দুটো সাদা ধুতি ঝুলিয়ে দেওয়া ; সেই ধুতি দুটোর মাঝে দাঁড়িয়ে সেই বাঁশটা ধ'রে চলা। অত বড় লম্বা একটা লোককে রাত্রি বেলায় ঐ রকম ভাবে চ'লে যেতে দেখলে ভূতেরই ভয় পায়, মানুষের ত কথাই নাই!

জিনের বাদশার পোষাক খু'লে নেবার পর দেখা গেল—সে আমাদের আল্লা-রাখা!

ভূতের সর্দ্দার আল্লা-রাখা তার চেলাচামুণ্ডা আসবাব-পত্র নিয়ে স'রে পড়ল। যেতে যেতে বল্‌লে, "আজ আর না, আজ জিন দেখলো, কা'ল গায়েবী খবর হুনবো!"

সকালে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল—কা'ল রাত্রে চান ভানুদের বাড়ী জিনের বাদশা এসেছিলেন? নারদ আলি বলেছিল তালগাছের মত লম্বা, কিন্তু গাঁয়ের লোক সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আসমান-ঠেকা ক'রে ছাড়্‌লে। মেয়েরা বল্‌তে লাগ্‌ল, "আইবোনা, অত বড় মাইয়া বিয়া না দিয়া থুইলে জিন আইবো না?"

কেউ কেউ বল্‌ল, চান্ ভানুর এত রূপ দেখে ওর ওপর জিন আশক হয়েছে, ওর ওপর জিনের নজর আছে। আহা, যে বেচারার বিয়ে হবে ওর সাথে, তাকে হয়ত বাসর-ঘরেই ঘাড় মট্‌কে মারবে!

সেদিন সারাদিন মোল্লাজি এসে চান্ ভানুর বাড়ীতে কোরাণ পড়লেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ্ হল। বলা বাহুল্য, ভূতেরাও এসে মৌলুদ শরীফ্

হয়ে সিদ্ধি খেয়ে গেল! সেদিন রাত্রে সোভান এবং আরো 'দু' একজন ওদের বাড়ীতে এসে শুয়ে থাক্‌ল।

গভীর রাত্রে বাড়ীর পেছনের তালগাছটায় একটা বাঁশী বেজে উঠল। ঘুম কারুরই হয়নি ভয়ে। সকলে জানালা দিয়ে দেখতে পেল, তালগাছের ওপর থেকে প্রায় বিশ হাত লম্বা কালো কুচকুচে একটা পা নীচের দিকে নাম্‌ছে। খড়্‌খড়্‌ খড়্‌খড় ক'রে তালগাছের পাতাগুলো নড়ে উঠ্‌ল। সাথে সাথে ঝম্‌ঝম্‌ ঝরঝম্‌ করে এক রাশ ধূলোবালি তালগাছ থেকে নারদ আলির টিনের চালের উপর পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছয়-সাতটা সুপারি গাছ এক সঙ্গে ভীষণভাবে দুল্‌তে লাগল। যেন ভেঙে পড়বে! অথচ গাছে কিছু নেই! এর পরে কি হয়েছিল, তার পরদিন সকালে, আর কেউ বলতে পার্‌ল না তার কারণ—ঐ টুকু পর্য্যন্ত দেখার পর ওরা ভয়ে বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়ে গেছিল!

এর পরেও যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, তা লোপ পেয়ে গেল—যখন একটা কৃষ্ণকায় বেড়াল তাল গাছের ওপর থেকে তাদের জান্‌লার কাছে এসে পড়ল!

সেইদিন রাত্রে ভূতেদের কমিটী, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'ল যে, আর ওদের ভয় দেখানো হবে না দু'চারদিন, তা হলে ওরা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। তালগাছ থেকে আনা ভূতের পা বা কালো কাপড় মোড়া বংশ দণ্ডটা নাড়্‌তে নাড়তে ভূতেদের সর্দ্দার আল্লা-রাখা বললে, "আমি এক বুদ্ধি ঠাওরাইছি। ভূতের দল উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল শুনবার জন্য।

আল্লা রাখা যা বল্‌ল তার মানে—সে ঠিক করেছে. কলকাতা থেকে একটা চিঠি ছাপিয়ে আনবে। আর সেই চিঠিটা আর একদিন স্বয়ং জিনের বাদ্‌শা নাযর আলির বাড়ীতে দিয়ে আসবে। বাস্, তা হ'লেই কেল্লা ফতে।

এই সব ব্যাপারে চান্ ভানুর বিয়ের দিন গেল আরও মাসখানিক পিছিয়ে। নানান্ গ্রামের পিশাচ-সিদ্ধ মন্ত্র-সিদ্ধ গুণীরা এসে নাযর আলীর বাড়ীর ভূতের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল! চারপাশের গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল!

সাত আট দিন ধ'রে যখন আর কোনো উপদ্রব হ'ল না, তখন সবাই বল্‌লে এই সব তন্ত্রমন্ত্রের চোটেই ভূতের পোলারা ল্যাজ তু'লে পালিয়েছে! যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

এদিকে—দ্বিতীয় দিনের ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরদিন সকালে, আল্লা-রাখা কলকাতার পুঁথি-ছাপা এক প্রেসের ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে সেখানে বহু মুসাবিদার পর নিম্ন-লিখিত চিঠি ও তার যা ছাপা হবে তার কপি পাঠিয়ে দিল। প্রেসের ম্যানেজারকে লিখিত চিঠিটা এই ঃ—

শ্রীশ্রীহকনাম ভরসা

মহাশয়

আমার ছালাম জানিবেন। আমার এই লেখাখানা ভাল ও উত্তমরূপে ছাপাইয়া দিবেন। আর জদি গরীবের পত্র খানা পাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে ছাপাইয়া দিবেন আর জদি গবিলতি করেন তবে

ঈশ্বরের কাছে ঢেকা থাকিবেন। আর ছাপিবার কত খরচ হয় তাহা লিখিয়া দিবেন। হুজুর ও মহাশয় গবিলতি করিবেন না। আর এমন করিয়া দিবেন চারিদিক দিয়া ফেসেং ও অতি উত্তম কাগজে ছাপিবেন।

ইতি। সন ১৩৩৭ সাল ১০ বৈশাখ।

আমাদের ঠিকানা

আল্লা-রাখা ব্যাপারী

উর্ফে কেশরঞ্জন বাবু। তাহার হাতে পঁহচে।

সাং মহনপুর,

পোঃ ড্যামুড্যা

জিং ফরিদপুর। (যেখানে আরিয়লখা নদী

সেইখানে পঁহচে।)

চিঠির সাথে জিনের বাদশার যে গৈবী বাণী ছাপ্‌তে দিল তা এই :—

বিসমিল্লা আল্লাহো আকবর

লা এলাহা এল্লেল্লা

গায়েব

হে নারদ আলি শেখ,

তোরে ও তোর বিবিরে বলিতেছি।

তোর ম্যায়্যা চান্ ভানুরে,

চুমু ব্যাপারীর পোলা আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দে। তারপর তোর

তোরা যদি না দেছ তবে বহুৎ ফেরেরে পরিবি, তোরা যদি আমার এই পত্রখানা পড়িয়া চুম্‌ ব্যাপারীর কাছে তোরা যদি প্রথম কছ তবে সে বলিবে কিএরে এই খানে বিবাহ দিবি। তোরা তবু ছারিছ্‌ না। তোরা একদিন আল্লা-রাখারে ডাকিয়া আনিয়া আর একজন মুন্সী আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।

খবরদার খবরদার

মাজগাঁয়ের ছেরাজ হালদার ইচ্ছা করিয়াছে তার পোলার জন্যে চান্‌ ভানুরে নিব। ইহা এখনও মনে মনে ভাবে। খবরদার। খবরদার। খোদাতাল্লার হুকুম হইয়াছে আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দিতে। আর যদি খোদাতাল্লার হুকুম অমান্য করেছ তবে শেষে তোর ম্যাইয়্যা ছেম্‌রি দুস্কু ও জালার মধ্যে পরিবে।

খবরদার—হুসিয়ার—সাবধান আমার এই পেত্রের উপর ইমান না আনিলে কাফের হইয়া যাইবি।

তোরা আল্লার কাছে বিবাহ দেছ বিবাহের শেষে স্বপনে আমার দেখা পাইবি। চান্‌ভানু আমার ভইনের লাহান। আমি উহারে মাল-মাত্তা দিব। দেখ তোরে আমি বার বার বলিতেছি—তোর ম্যায়ার আল্লারাখা ছেম্‌রার কাছে সাদি বহিবার একান্ত ইচ্ছা। তবে যদি এ বিবাহ না দেছ, তবে শেষে আলামত দেখিবি। ইতি

জিনের বাদছা
গায়েবুল্লা।

এই কপির কোণাতেও বিশেষ করে সে অনুরোধ করে দিল যেন ছাপার চারি কিনারায় 'ফেসেং' হয়! ……

কল্‌কাতা শহর, টাকা দিলে নাকি বাঘের দুধ পাওয়া যায়! এই দৈবি বাণীও আট দশ দিনের মধ্যে প্রেস থেকে ছাপা হয়ে এল। আল্লা-রাখার আর আনন্দ ধরে না।

আবার ভূতের কমিটি বস্‌ল। ঠিক হ'ল সেই রাত্রেই ছাপানো গৈবী বাণী নারদ আলির বাড়ীতে রেখে আসতে হবে। জিনের বাদশার সেই পোষাক পরে আল্লারাখা যাবে ওদের বাড়ীতে। যদি কেউ জেগে উঠে ঐ চেহারা দেখে, তার দাঁতে দাঁত লাগাতে দেরী হবেনা।

সেদিন রাত্রে জিনের বাদসার গৈবী বাণী বিনা বাধায় চালের মটকা ভেদ করে চান্ ভানুর বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পড়ল। সকাল হতে না হ'তেই আবার গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল।

নারদ আলী ভীষণ ফাঁপরে পড়্‌ল। জিনের বাদ্‌শার হুকুম মতে বিয়ে না দিলেই নয় আল্লা-রাখার সাথে, ওদিকে কিন্তু ছেরাজ হালদারও ছাড়বার পাত্র নয়। ভূত, জিন, পরী এত রটনা সত্ত্বেও ছেরাজ তার ছেলেকে এই মেয়ের সাথেই বিয়ে দেবে দৃঢ় পণ করে বসেছিল। মাজগাঁ এবং মোহনপুরের কোনো লোকই তাকে টলাতে পারেনি। সে বলে "খোদায় যদি হায়াত দেয় আমার পোলারে কোনো হালার ভূতের পো মারবার পারব না। একদিন ত ওরে মরবারই অইবো, অর কপালে যদি ভূতের হাতেই মরণ লেহা থাকে, তারে হওাইব কেডা?"

আসল কথা ছেরাজ অতি মাত্রায় ধূর্ত্ত ও বুদ্ধিমান। সে বুঝেছিল, চান্ ভানু বাপ মার একমাত্র সন্তান, তার ওপর সুন্দরী ব'লে কোনো

বদমায়েস লোক সম্পত্তি আর মেয়ের লোভে এই কীর্ত্তি কর্‌ছে। অবশ্য, ভূত যে ছেরাজ বিশ্বাস করত না, তাকে ভয় করত না—এমন নয়। তবে সে মনে করছিল, যে লোকটা এই কীর্ত্তি করছে—সে নিশ্চয় টাকা দিয়ে কোনো পিশাচ-সিদ্ধ লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কাজেই বিয়ে হয়ে গেলে অন্য একজন পিশাচ-সিদ্ধ গুণীকে দিয়ে এ সব ভূত তাড়ানো বিশেষ কষ্টকর হবে না! এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোন্ মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে!

ছেরাজের পুত্রও পিতার মতই সাহসী, চতুর এবং শেয়ানা। সে মনে করেছিল, বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর ভূতটুতগুলো ভাল ক'রে গুণী দিয়ে ছাড়িয়ে পরে বৌ-এর কাছ ঘেঁস্‌বে।

তারা বাপ-বেটায় পরামর্শ ক'রে ঠিক কর্‌লে—শুধু বিয়েটা হবে ওখানে গিয়ে। রুয়ৎ বা শুভ-দৃষ্টিটা কিছুদিন পরে হবে এবং শুভ-দৃষ্টির পরে ওরা বউ বাড়ীতে আন্‌বে। 'রুয়ৎ' না হওয়া পর্য্যন্ত চান্ ভানু বাপের বাড়ীতেই থাক্‌বে।

নারদ আলি সেরাজ হালদারকে একবার ডেকে পাঠাল তার কাছে। পাশেই গ্রাম। খবর শুনে তখনি সেরাজ হালদার এসে হাজির হল। ছাপানো "গৈবীবাণী" প'ড়ে সে অনেকক্ষণ চিন্তা করলে। তারপর স্থির কণ্ঠে সে ব'লে উঠল "তুমি যাই ভাব বেয়াই, আমি কইতাছি—এ গায়েবের খবর না, এ ঐ হালার পোলা আল্লা-রাখার কাজ। হালায় কোন্ ছাপাখানা থেইক্কা ছাপাইয়া আন্‌ছে। জিনের বাদসা তোমারে

ছাপাইয়া চিঠি দিব ক্যান্? জিনের বাদশারে আমি সালাম করি। কিন্তু বেয়াই, এ জিনের বাদশার কাম না। ঐ হালার পো হালার কাম যদি না অয়, আমি পঞ্চাশ জুতা খাইমু!"

সত্যই ত এ দিকটা ভেবে দেখেনি ওরা। কিন্তু জিনের বাদশাকে যে সে নিজে চোখে দেখেছে! ওরে বাপরে, ঘর সমান উঁচু মাথা, এক কোমর দাড়ি, মাথায় পাগ্ড়ি? সে অনেক অনুরোধ কর্‌ল ছেরাজ হালদারকে—হাতে পায়ে পর্য্যন্ত পড়্‌ল তার, তবু তাকে নিরস্ত করতে পার্‌ল না। ছেরাজ বল্‌লে, মরে যদি তারি ছেলে মরবে, এতে নারদ আলির ক্ষতিটা কি!

শেষে যখন ছেরাজ ক্ষতিপূরণের দাবি ক'রে চুক্তিভঙ্গের নালিশ কর্‌বে ব'লে ভয় দেখালে, তখন নারদ আলি হাল ছেড়ে দিলে।

চান্ ভানুর মা এতদিন কোনো কথা বলেনি। তার মুখে আর পূর্ব্বের হাসি-রসিকতা ছিলনা। কি যেন অজানা আশঙ্কায় এবং এই সব উৎপাতে সে একেবারে মুস্‌ড়ে পড়েছিল। মা-মেয়ে ঘর ছেড়ে আর কোথাও বেরোতো না। জল-দানো দেখার পর থেকে মেয়েকে জল তু'লে এনে দিত মা, তাতেই চান্ ভানু নাইত। আর সে নদীমুখো হয়নি। তাবিজে কবচে চানের হাতে কোমরে গলায় আর জায়গা ছিল না সোলা বেঁধে যেন ডুবন্ত জাহাজকে ধ'রে রাখার চেষ্টা!

চান্‌ও দিন দিন শুকিয়ে ম্লান হয়ে উঠ্‌ছিল। সকলের কাছে শুনে শুনে তারও বিশ্বাস হয়ে গেছিল, তার উপর জিন বা "আসেবের"

ভর হয়েছে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার চোখের ঘুম গেল উড়ে, মুখের হাসি গেল মুছে, খাওয়া পরা কোনো কিছুতে তার কোন মন রইল না। কিন্তু এত বড় মজার ভূত! ভূতই যদি তার ওপর ভর করে—তবে সে ভূত আল্লা-রাখার কথা বলে কেন? ভূতে ত এমনটি করে না কখনো! সে নিজেই আগলে থাকে তাকে—যার ওপর ভর করে। তবে কি এ ভূত আল্লা-রাখার পোষা? না, সে নিজেই এই ভূত?

এত অশান্তি দুশ্চিন্তার মাঝেও সে আল্লা রাখাকে কেন যেন ভুলতে পারে না। ওর অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি সর্ব্বদা জোর ক'রে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যত মন্দই হোক, চান্‌দের ও কোন অনিষ্টই করেনি সে। অথচ কি দুর্ব্ব্যবহারই না চান্ করেছে ওর সাথে! ওর মনে পড়ে গেল, এর মাঝে একদিন পাড়ার অন্য একটা বাড়ী থেকে নিজেদের বাড়ী আস্‌বার সময় আল্লা-রাখাকে সে পথে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে দেখেছিল। রাস্তায় আর কেউ ছিল না তখন। সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লা-রাখা বলেছিল, তাকে সাপে কামড়েছে! কোন্‌খানে কামড়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লা-রাখা তার বক্ষঃস্থল দেখিয়ে দিয়েছিল। সত্যই তার বুকে রক্ত পড়ছিল। চান্ ভানুর তখন লজ্জার অবসর ছিল না। একদিন ত এই আল্লা রাখাই তার প্রাণদান করেছিল নদী থেকে তুলে। সে আল্লা-রাখার বুকের ক্ষতস্থান চুষে খানিকটা রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে, আবার ক্ষতস্থানে মুখ দেবার আগে জিজ্ঞসা করেছিল—

কি সাপে কামড়েছে? আল্লা-রাখা নীরবে চান্ ভানুর চোখ দুটো দেখিয়ে দিয়েছিল। তার পর কেমন ক'রে টল্‌তে টল্‌তে চান্ ভানু বাড়ী এসে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল—আজ আর চানের সে কথা মনে নাই। কিন্তু একথা চান্ ভানু আর আল্লা-রাখা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ জানেনা।

চান্ ভানু বুঝেছিল—প্রতারণা করে আল্লা-রাখা তার বুকে চানের মুখের ছোঁওয়া পেতে ছুরি বা কিছু দিয়ে বুক কেটে রক্ত বের করেছিল, সাপের কথা একেবারেই মিথ্যা, তবু সে কিছুতেই আল্লা-রাখার উপর রাগ করতে পার্‌ল না। যে ওর একটু ছোঁওয়া পাবার জন্য—হোক তা মুখের ছোঁওয়া—অমন ক'রে বুক চিরে রক্ত বহাতে পারে, তার চেয়ে ওকে কে বেশী ভালবাসে বা বাস্‌বে! হয়ত তার হবু শ্বশুর ছেরাজ যা বলে গেল—তার সবই সত্য, তবু ঐ গ্রামের লোকের চক্ষুশূল ছোঁড়াটার জন্য ওর কেন এমন করে মন কাঁদে! কেন ওকে দিনে একবার দেখ্‌তে না পেলে ওর পৃথিবী শূন্য বলে মনে হয়!

সত্যিসত্যিই তাকে জিনে পেয়েছে, ভূতে পেয়েছে—হোক সে ভূত, হোক সে জিন, তবুত সে তাকে ভালবাসে, তার জন্যই ত সে একবার হয় জিনের বাদশা, একবার হয় তালগাছের একানো'ড়ে ভূত! চানের মনে হ'তে লাগ্‌ল, সাপে আল্লা-রাখাকে কামড়ায়নি, কামড়েছে তাকে, বিষে ওর মন জর্জ্জরিত হয়ে উঠ্‌ল।

মা'র মন অন্তর্যামী। সেই শুধু বুঝ্‌ল মেয়ের যন্ত্রণা, তার এমন দিনে

দিনে শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা। সেও এতদিনে সত্যকার ভূতকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লেও আর ফের্‌বার উপায় নেই। মেয়েকে নিজে হাতে জবাই করতে হবে! দুর্দ্দান্ত লোক সেরাজ হাল্‌দার, এ সম্বন্ধ ভাঙলে সে কেলেঙ্কারীর আর শেষ রাখবে না।

বাপ, মা, মেয়ে তিনজনেই অসহায় হয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

(৩)

কিছুতেই কিছু হ'লনা। জীবনে যে পরাজয় দেখেনি সে আজ পরাজিত হ'ল। জিনের বাদশা, তার দৈবী বাণী, যত রকম ভূত ছিল—একানো'ড়ে মাম্‌দো, সতর চোথীর মা, বেহ্মদোত্তি, কন্ধকাটা—সব মিলেও তার পরাজয় নিবারণ করতে পারলে না! তা ছাড়া আল্লা-রাখার আর পূর্ব্বের মত সে উৎসাহ ছিলনা। যে দিন চান্‌ ভানু তার চাঁদমুখ দিয়ে ওর বুকের রক্ত স্পর্শ করেছিল সেই দিন থেকে তার রক্তের সমস্ত বিষ—সমস্ত হিংসা দ্বেষ লোভ ক্ষুধা—সব যেন অমৃত হয়ে উঠেছিল। তার মনের দুষ্ট শয়তান সেই একদিনের সোনার ছোঁওয়ায় যেন মানুষ হয়ে উঠেছিল। পরশমণির ছোঁওয়া লেগে ওর অন্তরলোক সোনার রঙে রেঙে উঠেছিল! তার মনের ভূত সেই দিনই ম'রে গেল। * *

চান্‌ ভানুর বিয়ে হয়ে গেল। বর তার কেমন হ'ল, তা সে দেখতে পেলেনা। দেখবার তার ইচ্ছাও ছিলনা। বরও ক'নেকে দেখলে না ভয়ে—যদি তার ঘাড়ের জিন এসে তার ঘাড় মট্‌কে দেয়! ভাল ভাল গুণীর সন্ধানে বর সেই দিনই বেরিয়ে পড়্‌ল!

চান্‌ ভানুর যে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন সকালে

আল্লা-রাখার বাপ মা ভাই সকলে আল্লা-রাখাকে দেখে চমকে উঠল। তার সে বাবরি চুল নেই, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পরণে একখানা গামছা, হাতে পাঁচনী, কাঁধে লাঙ্গল। তার মা সব বুঝ্‌লে। তার ছেলে আর চান্‌ভানুকে নিয়ে গ্রামে যা সব রটেছে সে তার সব জানে। মা নীরবে চোক মুছে ঘরে চলে গেল। তার বাপ আর ভাইরা খোদার কাছে আল্লা-রাখার এই সুমতির জন্য হাজার শোকর ভেজল!…

দূরে হিজল গাছের তলায় আরো দুটী চোখ আল্লা-রাখার কৃষাণ মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সে-দিনকার প্রভাতের মেঘ্‌লা আকাশের মতই বাষ্পাকুল হয়ে উঠল—সে চোখ চান্‌-ভানুর! সে দৌড়ে গিয়ে আল্লা-রাখার পায়ের কাছে প'ড়ে কেঁদে উঠল "কে তোমারে এমন্‌ডা কর্‌ল"? আল্লা-রাখা শান্ত হাসি হেসে ব'লে উঠ্‌ল—"জিনের বাদ্‌শা!"

অগ্নি-গিরি

বীররামপুর গ্রামের আলি নসীব মিঞার সকল দিক দিয়েই আলি নসীব। বাড়ী, গাড়ী ও দাড়ির সমান প্রাচুর্য্য! ত্রিশাল থানার সমস্ত পাটের পাটোয়ারী তিনি।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁঠাল-কোয়ার মত টক্‌টকে রং। আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।

তাঁকে একমাত্র দুঃখ দিয়াছে—নিমকহারাম দাঁত ও চুল। প্রথমটা প'ড়ে দ্বিতীয়টার কতক গেছে উঠে, আর কতক গেছে পেকে। এই বয়সে এই দুর্ভোগের জন্য তাঁর" আফ্‌সোসের আর অন্ত নেই। মাথার চুলগুলোর অধঃপতন রক্ষা করবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেননি কিন্তু কিছুতেই যখন তা রুখ্‌তে পার্‌লেন না, তখন এই ব'লে সান্ত্বনা লাভ কর্‌লেন যে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডেরও টাক ছিল? তাঁর টাকের কথা উঠলে তিনি হেসে বল্‌তেন যে, টাক বড় লোকদের মাথাতেই পড়ে—কুলি-মজুরের মাথায় টাক পড়েনা! তা ছাড়া, হিসাব নিকেশ করবার জন্য নি-কেশ মাথারই প্রয়োজন বেশী। কিন্তু টাকের এত সুপারিশ কর্‌লেও তিনি মাথা থেকে সহজে টুপী নামাতে চাইতেন না। এ নিয়ে কেউ ঠাট্টা কর্‌লে তিনি বল্‌তেন—টাক আর টাকা দুটোকেই লুকিয়ে

রাখতে হয়, নৈলে লোকে বড় নজর দেয়। টাকা না হয় লুকোলেন, সাদা চুল দাড়িকে ত লুকোবার আর উপায় নেই। আর উপায় থাক্‌লেও তিনি আর তাতে রাজী নন্। একবার কলপ লাগিয়ে তাঁর মুখ এত ভীষণ ফু'লে গেছিল, এবং তার সাথে ডাক্তাররা এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল যে, সেইদিন থেকে তিনি তৌবা ক'রে কলপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু, সাদা চুল-দাড়িতে তাঁর এতটুকু সৌন্দর্য্য-হানি হয়নি। তাঁর গায়ের রংএর সঙ্গে মিশে তাতে বরং তাঁর চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে। এক বুক শ্বেত শ্মশ্রু—যেন শ্বেত বালুচরে শ্বেত মরালী ডানা বিছিয়ে আছে!

এঁরই বাড়ীতে থেকে ত্রিশালের মাদ্রাসাই পড়ে—সবুর আখন্দ। নামেও সবুর, কাজেও সবুর। শান্ত শিষ্ট গো-বেচারা মানুষটী। উনিশ-কুড়ির বেশী বয়স হবে না, গরীব শরীফ ঘরের ছেলে দেখে আলী নসীব-মিঞা তাকে বাড়ীতে রেখে তার পড়ার সমস্ত খরচ যোগান।

ছেলেটী অতি মাত্রায় বিনয়াবনত। যাকে বলে—সাত চড়ে রা বেরোবেনা। তার হাব-ভাব যেন সর্ব্বদাই বল্‌ছে—"আই হ্যাভ্ দি অনার টু বি সার ইওর মোষ্ট্ ওবিডিয়েণ্ট্ সার্‌ভেণ্ট্।

আলি নসীব মিঞার পাড়ার ছেলেগুলি অতি মাত্রায় দুরন্ত। বেচারা সবুরকে নিয়ে দিনরাত তারা প্যাচা খ্যাচ্‌রা করে। পথে ঘাটে ঘরে বাইরে তারা সবুরকে সমানে হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জল ছিঁচে উত্যক্ত করে। ছেঁচা জল আর মিছে কথা নাকি গায়ে বড় লাগে—কিন্তু

সবুর নীরবে এ সব নির্য্যাতন সয়ে যায়, একদিনের তরেও বে-সবুর হয়নি।

পাড়ার দুরন্ত ছেলের দলের সর্দ্দার রুস্তম। সেই নিত্য নূতন ফন্দি বের করে সবুরকে ক্ষ্যাপানোর। ছেলে মহলে সবুরের নাম প্যাঁচা মিঞা। তার কারণ, সবুর স্বভাবতই ভীরু নিরীহ ছেলে; ছেলেদের দলের এই অসহ্য জ্বালাতনের ভয়ে সে পারত পক্ষে তার এঁদো কুঠরি থেকে বাইরে আসে না। বেরুলেই প্যাঁচার পিছনে যেমন ক'রে কাক লাগে, তেমনি ক'রে ছেলেরা লেগে যায়।

সবুর রাগে না ব'লে ছেলেদের দল ছেড়েও দেয়না। তাদের এই ক্ষ্যাপানোর নিত্য নূতন ফন্দি আবিষ্কার দেখে পাড়ার সকলে যে হেসে লুটিয়ে পড়ে, তাতেই তারা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করে।

পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসা-পড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে। তাদের পাড়াতে কোনো মাদ্রাসার "তালবিলিম" (তালেবেএলম্ বা ছাত্র) জায়গীর থাকৃত না পাড়ার ছেলেগুলির ভয়ে। সবুরের অসীম ধৈর্য্য। সে এম্‌নি করে তিনটী বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আর একটা বছঁর কাটিয়ে দিলেই তার মাদ্রাঁসার পড়া শেষ হইয়া যায়।

সবুর বেরোলেই ছেলেরা আরম্ভ করে—"প্যাচারে তুমি ডাহ! হুই প্যাচা মিঞাগো, একডিবার খ্যাচ্‌খ্যাচাও গো!" রুস্তম রুস্তমী কণ্ঠে গান ধরে—

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাচা যায়—
যাইতে যাইতে খ্যাচ্ খ্যাচায়।

কাওওয়ায়া সব লইল পাছ,
প্যাচা গিয়া উঠ্‌ল গাছ।
প্যাচার ভাই শভা কোলা ব্যাং
কইল চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাচা কয়, বাপ বারিত্‌ যাও,
পাগ লইছে সব হাপের ছাও।
ইঁদুর জবাই কইর‍্যা খায়,
বোচা নাকে ফ্যাচফ্যাচায়!

ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়ে! বেচারী সবুর তাড়াতাড়ি তার কুঠরিতে ঢুকে দোর লাগিয়ে দেয়। বাইরে থেকে বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে রুস্তম গায়—

প্যাচা, একবার থ্যাচ্‌থ্যাচাও!
গর্ত্ত থাইক্যা ফুচ্‌কি দাঁও।
মুচকি হাইস্যা কও কথা,
প্যাচারে মোর খাও মাথা!

সবুর কথা কয় না। নীরবে বই নিয়ে পড়তে বসে। যেন কিছুই হয়নি। রুস্তমী দলও নাছোড়বান্দা। আবার গায়—

মেকুরের ছাও মক্কা যায়,
প্যাচায় পড়ে, দেইখ্যা আয়।

হঠাৎ আলি নসীব মিঞাকে দেখে ছেলের দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আলি নসীব মিঞা রসিক লোক। তিনি ছেলেদের হাত থেকে সবুরকে

খাঁচালেও না হেসে থাক্‌তে পার্‌লেন না। হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ঢুকে দেখেন তার একমাত্র সন্তান নূরজাহান কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার মায়ের কাছে নালিশ কর্‌ছে—কেন পাড়ার ছেলেরা রোজ রোজ সবুরকে অমন ক'রে জ্বালিয়ে মারবে? তাদের কেউ ত সবুরকে খেতে দেয় না!

তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে রুস্তমীদল গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল—

প্যাচা মিঞা কেতাব পড়ে
হাঁড়ী নড়ে দাড়ি নড়ে!

নূরজাহান রাগে তার বাবার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার যত রাগ পড়ল গিয়ে তার বাবার উপর। তার বাবা ত ইচ্ছা কর্‌লেই ওদের ধম্‌কে দিতে পারেন। বেচারা সবুর গরীব, স্কুলে পড়ে না, মাদ্রাসায় পড়ে—এই ত তার অপরাধ! মাদ্রাসায় না পড়ে সে যদি থানায় পড়ত ডোবায় পড়ত—তাতেই বা কার কি ক্ষতি হ'ত! কেন ওরা আদা জল খেয়ে ওর পিছনে এমন ক'রে লাগবে।

আলি নসীব মিঞা বুঝিলেন। কিন্তু বুঝেও তিনি কিছুতেই হাসি চাপতে পার্‌লেন না। হেসে ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "কি হয়েছেরে বেডি? ছেম্‌রাডা প্যাচার লাহান বাড়ীত্ বইয়া রইবো, একড়া কথা কইব না তাইনাসেন্ উয়ারে প্যাচা কয়।" নূরজাহান রেগে উত্তর দিল, 'আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেড়ায় ঘরে বইয়া কাঁদে, আর আপনি হাসেন। আমি পোলা অইলে এইছুন্ একচট্‌কনা দিতাম রুস্তাম্যাড়ে আর উই ইবলিশা পোলাপানেরে, যে, ঐ হানে পইড়া

যাইত উৎকা মাইয়্যা। উইঠ্যা আর দানাপানি খাইবার অইত না!”
ব'লেই কেঁদে ফেল্‌লে।

আলি নসীব মিঞা মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন, “চুপ দে বেডি, এইবারে ইবলিশের পোলারা আইলে দাবার পইর‍্যা লইয়া যাইব! মুন্‌শী বেডারে কইয়া দিবাম, হে ঐ রুস্তম্যারে ধইর‍্যা তার কান দুডা একেরে মুত্যা কইর‍্যা কাইট্যা হালাইবে!

নূরজাহান অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি উ'ঠে বলল, “আব্বাজান, চা খাইবেন নি?”

আলি নসীব মিঞা হেসে ফেলে বল্‌লেন, ‘বেডির বুঝি হ্যাইন চায়ের কথা মনে পয়্‌ল!”

নূরজাহান আলি নসীব মিঞার একমাত্র সন্তান ব'লে অতি মাত্রায় আদু'রে মেয়ে। বয়স পনের পেরিয়ে গেছে। অথচ মেয়ের বিয়ে দেবার নাম নেই বাপ-মায়ের। কথা উঠ্‌লে বলেন, মনের মত জামাই না পেলে বিয়ে দেওয়া যায় কি করে! মেয়েকে ত হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া যায় না। আসল কথা তা নয়। নূরজাহানের বাপ মা ভাবতেই পারেন না, ওঁদের ঘরের আলো নূরজাহান অন্য ঘরে চলে গেলে তাঁরা এই আঁধার পুরীতে থাকবেন কি ক'রে! নৈলে এত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর বরের অভাব হয় না। সম্বন্ধও যে আসে না, এমনও নয়; কিন্তু আলি নসীব মিঞা এমন উদাসীনভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেন যে, তারা আর বেশী দূর না এগিয়ে সরে পড়ে।

নূরজাহান বাড়ীতে থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। এখন সবুরের কাছে উর্দ্দু পড়ে। শরীফ ঘরের এত বড় মেয়েকে অনাত্মীয় যুবকের কাছে প'ড়তে দেওয়া দূরের কথা, কাছেই আস্‌তে দেয় না বাপ মা; কিন্তু এদিক দিয়ে সবুরের এতই সুনাম ছিল যে, সে নূরজাহানকে পড়ায় জেনেও কোনো লোক এতটুকু কথা উত্থাপন করেনি।

সবুর যতক্ষণ নূরজাহানকে পড়ায় ততক্ষণ একভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে থাকে, একটীবারও নূরজাহানের মুখের দিকে ফিরে তাকায় না। বাড়ী ঢোকে মাথা নীচু ক'রে, বেরিয়ে যায় মাথা নীচু ক'রে! নূরজাহান, তার বাবা মা সকলে প্রথম প্রথম হাস্‌ত—এখন সয়ে গেছে!

সত্যসত্যই, এই তিন বছর সবুর এই বাড়ীতে আছে, এর মধ্যে সে একদিনের জন্যও নূরজাহানের হাত আর পা ছাড়া মুখ দেখেনি!

এ নূরজাহান জাহানের জ্যোতি না হ'লেও বীররামপুরের জ্যোতি—জোহরা সেতারা, এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈধ নাই। নূরজাহানের নিজেরও যথেষ্ট গর্ব্ব আছে, মনে মনে তার রূপের সম্বন্ধে।

আগে হ'ত না—এখন কিন্তু নূরজাহানের সে অহঙ্কারে আঘাত লাগে—দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তার রূপের কি তা' হ'লে কোনো আকর্ষণই নেই? আজ তিন বছর সে সবুরের কাছে পড়্‌ছে—এত কাছে তবু সে একদিন মুখ তুলে তাকে দেখ্‌ল না? সবুর

তাকে ভালোবাসুক—এমন কথা সে ভাবতেই পারে না,—কিন্তু ভালো না বাস্‌লেও যার রূপের এত খ্যাতি এ অঞ্চলে—যাকে একটু দেখতে পেলে অন্য যে কোনো যুবক জন্মের জন্য ধন্য হয়ে যায়—তাকে একটা বার একটুক্ষণের জন্যেও সে চেয়েও দেখ্‌ল না! তার সতীত্ব কি নারীর সতীত্বের চেয়েও ঠুন্‌কো?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে সবুরের উপর তার আক্রোশ বেড়ে ওঠে, মন বিষিয়ে যায়, ভাবে আর তার কাছে পড়বে না। কিন্তু যখন দেখে—নির্দ্দোষী নির্বিরোধী নিরীহ সবুরের উপর রুস্তমী দল ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তখন আর থাক্‌তে পারে না। আহা, বেচারার হয়ে কথা কইবার যে কেউ নেই! সে নিজেও যে একটীবার মুখ ফু'টে প্রতিবাদ করে না! এ কি পুরুষ মানুষ বাবা! মার, কাট, মুখ দিয়ে কথাটী নেই! এমন মানুষও থাকে দুনিয়াতে!

যত সে এই সব কথা ভাবতে থাকে, তত এই অসহায় মানুষটার ওপর করুণায় নূরজাহানের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে!

সবুর পুরুষ বল্‌তে যে মর্দ্দ-মিন্‌সে বোঝায়—তা ত নয়ই, সুপুরুষও নয়। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারা। রূপের মধ্যে তার চোখ দু'টী। যেন দুটী ভীরু পাখী। একবার চেয়েই অম্‌নি নত হয়ে পড়ে। সে চোখ, তার চাউনি—যেমন ভীরু, তেমনি করুণ, তেম্‌নি অপূর্ব্ব সুন্দর! পুরুষের অত বড় অত সুন্দর চোখ সহজে চোখে পড়ে না।

এই তিন বছর সে এই বাড়ীতে আছে, কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞাসা

না কয়লে—সে অন্ত লোক তো দূরের কথা—এই বাড়ীরই কারুর সাথে কথা কয় নি। নামাজ পড়ে, কোরাণ তেলাওত করে, মাদ্রাসা যায়, আসে, পড়ে কিম্বা ঘুমায়—এই তার কাজ। কোনো দিন যদি ভুলক্রমে ভিতর থেকে খাবার না আসে, সে না খেয়েই মাদ্রাসা চ'লে যায়—চেয়ে খায় না। পেঠ না ভরলেও দ্বিতীয় বার খাবার চেয়ে নেয় না। তেষ্টা পেলে পুকুর ঘাটে গিয়ে জল খেয়ে আসে, বাড়ীর লোকের কাছে চায় না!......

সবুর এত অসহায় বলেই নূরজাহানের অন্তরের সমস্ত মমতা সমস্ত করুণা ওকে সদাসর্ব্বদা ঘিরে থাকে। সে না থাক্‌লে, বোধ হয় সবুরের খাওয়াই হ'ত না সময়ে। কিন্তু নূরজাহানের এত যে যত্ন এত যে মমতা এর বিনিময়ে সবুর এতটুকু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েও তাকে দেখেনি কিছু বলা ত দূরের কথা। মারলে-কাটলেও অভিযোগ করে না, সোনা-দানা দিলেও কথা কয় না!

(২)

সেদিন আলি নসীব মিঞার বাড়ীতে একজন জবরদস্ত পশ্চিমে মৌলবী সাহেব এসেছেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ ও ওয়াজ্‌ নসীহৎ হবে। মৌলবী সাহেবের সেবা-যত্নের ভার পড়েছে সবুরের উপর। বেচারা জীবনে এত বেশী বিব্রত হয়নি। কি করে, সে তার সাধ্যমত মৌলবী সাহেবের খেদ্‌মত কর্‌তে লাগ্‌ল।

সবুরকে বাইরে বেরুতে দেখে রুস্তমী দলের একটী দুটী করে ছেলে এসে জুটতে লাগ্‌ল। তাদের দেখে সবুর বেচারার, ভাসুরকে দেখে ভাদ্র-বউর যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হ'ল!

মৌলবী সাহেবের পাগড়ির ওজন কত, দাড়ির ওজন কত, শরীরটাই বা কয়টা বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারবে না, তাঁর গোঁফ উই-এ না ইঁদুরে খেয়েছে,—এই সব গবেষণা নিয়েই রুস্তমীদল মত্ত ছিল, রুস্তম তখনো এসে পৌছেনি ব'লে সবুরকে জ্বালাতন করা সুরু করেনি।

হঠাৎ মৌলবী সাহেব বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে সবুরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সে কি করে। সবুর বিনীতভাবে বল্‌লে সে তালেবে এল্‌ম্‌ বা ছাত্র। আর যায় কোথা! ইউসোফ ব'লে উঠ্‌ল "প্যাচা মিঞা কি কইল, রে ফজল্যা?

ফজল হেসে গড়িয়ে পড়ে বল্‌লে, "প্যাচা মিঞা কইল, মুই তাল্‌বিলিম!" ততক্ষণে রুস্তম এসে পড়েছে। সে ফজলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল্‌, "কেডা তালবিল্লি! প্যাচা মিঞা?" ছেলেরা হাস্‌তে হাস্‌তে শুয়ে পড়ে রোলারের মত গড়াতে লাগ্‌ল! "হয়! রুস্তম্যা জোর কইছে রে! তালবিল্লি! —উরে বাপ্‌পুরে! ইল্লারে বিল্লা! তালবিল্লি— হি হি হি হা হা হা!" বলে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে! কত্তা-পে'ড়ে হাসি!

বেচারা সবুর ততক্ষণে মৌলবী সাহেবের সেবা টেবা ফেলে তার কামরায় ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছে! রুস্তম সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে গাইতে লাগ্‌ল—

প্যাচা অইলো তালবিল্লি,
দেওবন্দ্‌ যাইয়া যাইবো দিল্লি!
আইয়া কর্‌বো চিল্লাচিল্লি—
কুত্তার ছাও আর ইল্লিবিল্লি!

মৌলবী সাহেব আর থাক্‌তে পারলেন না। আস্তিন গুটিয়ে ছেলেদের তাড়া করে এলেন। ছেলেরা তাঁর বিশিষ্টরূপে শালের মত বিশাল দেহ দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে গেয়ে গেল—

উল্লু আয়া লাহোর সে
আজ পড়েগা আলেফ বে।

মৌলবী সাহেব বিশুদ্ধ উর্দ্দু ছেড়ে দিয়ে ঠেট্ হিন্দিতে ছেলেদের আত্মশ্রাদ্ধ করতে লাগিলেন।

আলি নসীব মিঞা সব শুনে ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। আজ মৌলবী সাহেবের সামনে তাদের বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেবেন। কিন্তু ছেলেদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছেলেরা ততক্ষণে তিন চার মাইল দূরে এক বিলের ধারে ব্যাং সংগ্রহের চেষ্টায় বেড়াচ্ছে। মৌলবী সাহের তাদের তাড়া করায়, তারা বেজায় চটে গিয়ে ঠিক করেছে—আজ মৌলবী সাহেবের ওয়াজ্ পণ্ড কর্‌তে হবে। স্থির হয়েছে, যখন বেশ জ'মে আস্‌বে ওয়াজ্, তখন একজন ছেলে একটা ব্যাং-এর পেট এমন করে টিপবে যে ব্যাংটা ঠিক সাপেধরা ব্যাং-এর মত করে চ্যাচাবে ; ততক্ষণ আর একজন আর একটা ব্যাং মজলিসের মাঝখানে ছেড়ে দেবে, সেটা যখন লাফাতে থাক্‌বে—তখন অন্য একজন ছেলে চীৎকার করে উঠ্‌বে—সাপ ! সাপ !

ব্যাস্ ! তাহলেই ওয়াজের দফা ঐখানেই ইতি।

বহু চেষ্টার পর গোটাকতক ব্যাং ধরে নিয়ে যে-যার বাড়ী ফির্‌ল।

আলি নসীব মিঞার বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বারী ব'লে উঠল, "রুস্তম্যারে, হালার তালবিল্লি, পায়খানায় গিয়াছে। বদনাটা উডাইয়া লইয়া আইমু ?"

রুস্তম খুশী হয়ে তখনি হুকুম দিল। বারী আস্তে আস্তে বদনাটা উঠিয়ে এনে পুকুর-ঘাটে রেখে দিয়ে এল !

একঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল, সবুর যেমন অবস্থায় গিয়ে বসেছিল তেমনি অবস্থায় বসে রইল পায়খানায় ! বেরও হয়না, কাউকে দিয়ে

বদনাও চায়না! দূরে আলি নসীব মিঞাকে দেখে ছেলের দল যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল!

আলি নসীব মিঞা ভাবলেন, নিশ্চয় সবুরের কিছু একটা করছে পাজী ছেলের দল। কিন্তু এসে সবুরকে দেখতে না পেয়ে বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তারাও কিছু জানে না বল্‌লে। ছেলের দল হল্লা করছিল "তালবিল্লি" ব'ল—এইটুকুই তারা জানে।

আরো দুই ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর সবুরের সন্ধান পাওয়া গেল। সবুর সব বল্‌লে। কিন্তু তাতে উলটো ফল হল। আলী নসীব মিঞা তাকেই বকতে লাগলেন—সে কেন বেরিয়ে এসে কারুর কাছে বদনা চাইলে না—এ ব্যাপার শুনে নূরজাহান রাগ করার চেয়ে হাস্‌লেই বেশী! এমন সোজা মানুষ হয়।

আর একদিন সে হেসেছিল সবুরের দুর্দ্দশায়। সবুর একদিন চুল কাটাচ্ছিল। রুস্তম তা দেখতে পেয়ে পিছন থেকে নাপিতকে ইশারায় একটা টাকার লোভ দেখিয়ে মাঝখানে টিকি রেখে দিতে বলে। সুশীল নাপিতও তা পালন করে। চুল কেটে স্নান করে সবুর যখন বাড়ীতে খেতে গেছে, তখন নূরজাহানেরই চোখে পড়ে প্রথম তার দৃশ্য। নূরজাহানের হাসিতে যে ব্যাথা পেয়েছিল সবুর, তা সেদিন নূরজাহানের চোখ এড়ায়নি।

আজ আবার হেসে ফেলেই নূরজাহানের মন ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল সবুরের সে দিনের মুখ স্মরণ ক'রে। কি জানি কেন, তার চোখ জল ভ'রে উঠ্‌ল।

সন্ধ্যায় যখন মৌলবী সাহেব ওয়াজ কর্‌ছেন, এবং ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর কথা যত বুঝ্‌তে না পারছে, তত ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠ্‌ছে—তখন সহসা মজলিসের এক কোণায় অসহায় ভেকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। শ্রোতৃবৃন্দ চকিত হয়ে উঠ্‌ল। একটু পরে দেখা গেল, রক্তাক্ত কলেবর বুঝিবা সেই ভেক-প্রবরই উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মাথার উপর দিয়ে হাউণ্ড রেস্ আরম্ভ ক'রে দিল! সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠ্‌ল—সাপ! সাপ!

আর বল্‌তে হ'লনা। মিমেষে যে যেখানে পার্‌ল—পালিয়ে গেল। মৌলবী সাহেব তক্তাপোষে উ'ঠে পড়ে তাঁর জাব্বা-জোব্বা ঝাড়্‌তে লাগলেন। আর ওয়াজ্ হ'লনা সেদিন!

মৌলবী সাহেব যখন খেতে বসেছেন, তখন অদূরে গান শোনা গেল—

"উলু! বোলো" কহে সাপ
উলু বোলে—"বাপ্‌রে বাপ!"
"কাল নসীহত হোগা ফের?"
উলু বোলে—কেয়্ কেয়্ কেয়্!
লে উঠা লোটা কম্বল্
উলু! আপনা ওতন্ চল্!

সহসা মৌলবী সাহেবের গলায় মুর্গীর ঠ্যাং আট্‌কে গেল! আলি নসীব মিঞা নিষ্ফল আক্রোশে ফুল্‌তে লাগলেন!

(৫)

সেদিন রাস্তা দিয়ে গফরগাঁও-এর জমীদারদের হাতী যাচ্ছিল। নূরজাহান বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বেচারা সবুরও হাতী দেখার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাতীটার দিকে দেখিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল "এরিও তালবিল্লি মিঞা গো! হুই তোমাগ বাছুরমুড়া আইতেছে, ধইরা লইয়াও।" রাস্তার সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল! রাস্তার একটা মেয়ে বলে উঠল, "বিজাত্যার পোলাডা! হাতীটা বাছুর না, বাছুর তুই!" ভাগ্যিস্ রুস্তম শুন্‌তে পায়নি।

নূরজাহান তেলেবেগুণে জ্বলে উঠল! সে যত না রাগল ছেলেগুলোর উপর, তার অধিক রেগে উঠল সবুরের উপর। সে প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে, আজ তাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেবে। এই কি পুরুষ!, মেয়েছেলেরও অধম যে!

সেদিন সন্ধ্যায় যখন পড়াতে গেল সবুর, তখন কোনো ভূমিকা না ক'রে নূরজাহান ব'লে উঠল, "আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুড়াইয়া চইল্যা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছেনা;"

সবুর আজ যেন ভুলেই তার ব্যথিত চোখ দুটী নূরজাহানের মুখের উপর তুলে ধরল! কিন্তু চোখ তুলে যে রূপ সে দেখলে. তাতে তার ব্যথা লজ্জা অপমান সব ভুলে গেল সে! দুই চোখে তার অসীম। বিস্ময় অনন্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল! এই তুমি! সহসা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"নূরজাহান!"

নূরজাহানও বিস্ময়-বিমূঢ়ার মত তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। এ কোন্ বনের ভীরু হরিণ? অমন হরিণচোখ যার, সে কি ভীরু না হয়ে পারে? নূরজাহান কখনো সবুরকে চোখ তু'লে চাইতে দেখেনি। সে রাস্তা চল্‌তে কথা কইত—সব সময় চোখ নীচু করে। মানুষের চোখ যে মানুষকে এত সুন্দর করে তুলতে পারে—তা আজ সে প্রথম দেখ্‌ল!

সবুরের কণ্ঠে তার নাম শুনে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বর্ষারাতের চাঁদকে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ঘিরে ফেল্‌ল!

আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত-মহাসাগরে ঝড় উঠেছে। মৌনী পাহাড় কথা কয়না, কিন্তু সে যেদিন কথা কয়, সেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নি-গিরি!

সবুরের চোখে মুখে পৌরুষের প্রখর দীপ্তি ফু'টে উঠল। সে নূরজাহানের দিকে দীপ্ত চোখে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ঐ পোলাপানেরে যদি জওয়াব দিই, তুমি খুশী হও? নূরজাহানও চক্‌চ'কে চোখ তু'লে ব'লে উঠ্‌ল "কে জওয়াব দিবো? আপনি!"

এ মৃদু বিদ্রূপের উত্তর না দিয়ে সবুর তার দীর্ঘায়ত চোখ দুটীর জ্বলন্ত ছাপ নূরজাহানের বুকে বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেল! নূরজাহান

আত্ম-বিস্মৃতের মত সেইখানেই ব'সে রইল। তার দুটী সুন্দর চোখ আর তদোধিক সুন্দর চাউনী ছাড়া আর কোনো কিছু মনে রইল না! যে সবুরকে কেউ কখনো চোখ তু'লে চাইতে দেখেনি, আজ সে উজ্জ্বল চোখে, দৃপ্তপদে রাস্তায় পায়চারী কর্‌ছে দেখে সকলে অবাক হয়ে উঠল!

রুস্তমীদল গাঙের পার থেকে বেড়িয়ে সেই পথে ফির্‌ছিল। হঠাৎ ফজল চীৎকার ক'রে উঠল—"উইরে তালবিল্লি!"

সবুর ভাল ক'রে আস্তিন গুটিয়ে নিল।

বারী পিছু দিক থেকে সবুরের মাথায় ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠল, "প্যাচারে, তুমি ডাহ!"

সবুর কিছু না ব'লে এমন জোরে বারীর গালে এক থাপ্‌পড় বসিয়ে দিল যে, সে সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরিয়ে প'ড়ে গেল। সবুরের এ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে দলের সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল!

সবুর কথাটী না বলে গম্ভীরভাবে বাড়ীর দিকে যেতে লাগ্‌ল। বারী ততক্ষণে উ'ঠে বসেছে। উঠেই সে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"সে হালায় গেল কৌহ্?"

বলতেই সকলের যেন হুঁস ফিরে এল। মার্ মার্ ক'রে সকলে গিয়ে সবুরকে আক্রমণ করলে। সবুরও—অসীম সাহসে তাদেরে প্রতি আক্রমণ করলে। সবুরের গায়ে যে এত শক্তি, তা কেউ কল্পনাও কর্‌তে পারেনি? সে রুস্তমীদলের এক এক জনের টুঁটী ধ'রে পাশে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌ল।

আলী নসীব মিঞার এই পুকুরটা নতুন কাটানো হয়েছিল, আর তার মাটীও ছিল অত্যন্ত পিছল। কাজেই যারা পুকুরে পড়তে লাগল গড়িয়ে—তারা বহু চেষ্টাতেও পুকুরের অত্যুচ্চ পাড় বেয়ে সহজে উঠ্‌তে পারল না। পা পিছ্‌লে বারে বারে জলে পড়্‌তে লাগল গিয়ে। এইরূপে যখন দলের পাঁচ ছয় জন, মায় রুস্তম সর্দ্দার, জলে গিয়ে পড়েছে—তখন রুস্তমী দলের আমীর তার পকেট থেকে দু-ফলা ছুরিটা বের ক'রে সবুরকে আক্রমণ করল। ভাগ্যক্রমে প্রথম ছুরির আঘাত সবুরের বুকে না লেগে হাতে গিয়ে লাগল। সবুর প্রাণপণে আমীরের হাত মুচড়ে ধরতেই সে ছুরি সমেত—উল্টে পড়ে গেল এবং আমীরের হাতের ছুরি আমীরেরই বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল! আমীর একবার মাত্র "উঃ" ব'লেই অচৈতন্য হয়ে গেল! বাকী যারা যুদ্ধ করছিল—তারা পাড়ায় গিয়ে খবর দিতেই পাড়ার লোক ছুটে এল। আলী নসীব মিঞাও এলেন।

সবুর ততক্ষণে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত শরীর নিয়েই আমীরকে কোলে তুলে নিয়ে তার বুকের ছুরিটা তুলে ফেলে সেই ক্ষতমুখে হাত চেপে ধরেছে। আর তার হাত বেয়ে ফিনিক্ দিয়ে রক্ত-ধারা ছুঠে চলেছে!

আলি নসীব মিঞা তাঁর চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দুই হাত দিয়ে তাঁর চক্ষু ঢেকে ফেল্‌লেন।...

একটু পরে ডাক্তার এবং পুলিস দু ই এল। আমীরকে নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়, সবুরকে নিয়ে গেল থানায়!

সবুরকে থানায় নিয়ে যাবার আগে দারোগাবাবু আলি নসীব মিঞার অনুরোধে তাঁকে একবার তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সে দারোগাবাবুর কাছে একটুও অতিরঞ্জিত না ক'রে সমস্ত কথা খু'লে বল্‌লে। তার কথা অবিশ্বাস করতে কারুরই প্রবৃত্তি হ'ল না। দারোগাবাবু বললেন, "কেস খুব সিরিয়স্ নয়, ছেলেটা বেঁচে যাবে! এ কেশ আপনারা আপোসে মিটিয়ে ফেলুন সাহেব।"

আলী নসীব মিঞা বল্‌লেন, "আমার কোনো আপত্তি নাই দারোগা সাহেব, আমীরের বাপে কি কেস মিটাইব? তারে ত আপনি জানেন। যারে কয় এক্কেরে বাঙাল!

দারোগাবাবু বল্‌লেন, 'দেখা যাক, এখন ত ওকে থানায় নিয়ে যাই। কি করি, আমাদের কর্ত্তব্য করতেই হবে।

ততক্ষণে আলী নসীব মিঞার বাড়ীতে কান্নাকাটী প'ড়ে গেছে। এই খবর শুনেই নূরজাহান মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল। আলী নসীব মিঞা যখন সবুরকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন নূরজাহান একেবারে প্রায় সবুরের পায়ের কাছে প'ড়ে কেঁদে উঠল, "কে তোমারে এমনডা করবার কইছিল? কেন এমনডা করলে?'

নূরজাহানের মা সবুরকে তার গুণের জন্য ছেলের মতই মনে করতেন। তা ছাড়া, তাঁর পুত্র না হওয়ায় পুত্রের প্রতি সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ গোপনে সবুরকে ঢেকে দিয়েছিলেন। তিনি সবুরের মাথাটা বুকের উপর চেপে ধ'রে কেঁদে আলীনসিব মিঞাকে বল্‌লেন "আমার পোলা এ, আমি

দশহাজার ট্যাহা দিবাম, দারোগাবাবুডারে কন, হে এরে ছ্যাইর্যা দিয়া যাক্ !"

সবুর তার রক্তমাখা হাত দিয়ে নূরজাহানকে তু'লে ব'লে উঠল, "আমি যাইতেছি ভাই ! যাইবার আগে দেহাইয়া গেলাম—আমিও মানুষের পোলা। এ যদি না দেহাইতাম, তুমি আমায় ঘৃণা কর্‌ত্যা ! খোদায় তোমায় সুখে রাখুন!" ব'লেই তার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বল্‌লে, "আম্মাগো ! এই তিন্‌ডা বছরে আপনি আমায় আমার মায়ের শোক ভুলাইছিলেন।" আর সে বলতে পারল না—কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আলি নসীব মিঞার পদধূলি নিয়ে সে নির্ব্বিকারচিত্তে থানায় চ'লে গেল ! দারোগা বাবু কিছুতেই জামীন দিতে রাজী হলেন না। দশ হাজার টাকার বিনিময়েও না, খুনী আসামীকে ছেড়ে দিলে তাঁর চাকুরি যাবে।

নূরজাহানের কানে কেবল ধ্বনিত হ'তে লাগল, "তুমি আমায় ঘৃণা কর্‌তে ! তার ঘৃণায় সবুরের কি আস্‌ত যেত ? কেন সে তাকে খুশী করবার জন্য এমন ক'রে "মরিয়া হইয়া" উঠল ? সে যদি আজ এমন ক'রে না বলত সবুরকে, তা হ'লে কখনই সে এমন কাজ করত না। এমন নির্য্যাতন ত সে তিন বছর ধ'রে সয়ে আসছে। তারই জন্য আজ সে থানায় গেল ! দুদিন পরে হয়ত তার জেল, দ্বীপান্তর—হয়ত বা তার চেয়েও বেশী—ফাঁসি হয়ে যাবে ! "উঃ" ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল !

আলী নসীব মিঞা যেন আজ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন আজ

সবুর তার দুঃখ দিয়ে তাঁর সুখের বাকী দিনগুলোকেও মেঘাচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে গেল! একবার মনে হ'ল, বুঝি বা দুধ-কলা দিয়ে তিনি সাপ পুষেছিলেন। পরক্ষণেই মনে হ'ল সে সাপ নয় সাপ নয়! ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক! আর—যদি সাপই হয়—তা হ'লেও ওর মাথায় মণি আছে! ও জা'ত সাপ!

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, তাঁর অনুকম্পায় প্রতিপালিত হ'লেও বংশ-মর্য্যাদায় সবুর তাঁদের চেয়েও অনেক উচ্চে। আজ সে দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন, নিঃসহায়—কিন্তু একদিন এদেরি বাড়ীতে আলী নসীব মিঞার পূর্ব্বপুরুষেরা নওকরী ক'রেছেন। তা ছাড়া এই তিন বছর তিনি সবুরকে যে অন্নবস্ত্র দিয়েছেন, তার বিনিময়ে সে তাঁর কন্যাকে উর্দ্দূ ও ফার্সিতে যে কোন মাদ্রাসার ছেলের চেয়েও পারদর্শিনী ক'রে দিয়ে গেছে। আলি নসীব মিঞা নিজে মাদ্রাসাপাস হলেও মেয়ের কাছে তাঁর উর্দ্দূ ফার্সি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে ভয় হয়। সে ত এতটুকু ঋণ রাখিয়া যায় নাই! শ্রদ্ধায় প্রীতিতে পুত্রস্নেহে তাঁর বুক ভ'রে উঠল!··· যেমন ক'রে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে!

নিজের জন্য নয়, নিজের চেয়েও প্রিয় ঐ কন্যার জন্য! আজ ত আর তাঁর মেয়ের মন বুঝ্‌তে বাকী নেই। অন্যের ঘরে পাঠাবার ভয়ে মেয়ের বিয়ের নামে শিউরে উঠেছেন এতদিন; আজ যদি এই ছেলের হাত মেয়েকে দেওয়া যায়—মেয়ে সুখী হবে, তাকে পাঠাতেও হবে না অন্য ঘরে। সে-ই ত ঘরের ছেলে হয়ে থাক্‌বে। উচ্চশিক্ষা? মাদ্রাসার

শেষ পরীক্ষা ত সে দিয়েইছে—পাসও করবে সে হয়ত সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রবে। তারপর কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিলেই হবে!

এই ভবিষ্য সুখের কল্পনা ক'রে—আলী নসিব মিঞা অনেকটা শান্ত হলেন এবং মেয়েকেও সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সে রাত্রে নূরজাহানের আর মূর্চ্ছা হ'ল না, সে ঘুমাতেও পারল্ না। সমস্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল—সেই দুটী চোখ, দুটী তারার মত! প্রভাতী তারা আর সন্ধ্যাতারা।

আমীরকে বাঁচানো গেল না মৃত্যুর হাত থেকে—সবুরকে বাঁচানো গেল না জেলের হাত থেকে!

ময়মন সিংহের হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথেই তার মৃত্যু হ'ল। আমীরের পিতা কিছুতেই মিটমাট করতে রাজী হলেন না। তিনি এই বলে নালিশ করলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল নূরজাহানের সাথে আমীরের বিয়ে দেন, আর তা জান্‌তে পেরেই সবুর তাকে হত্যা করেছে। তার কারণ, সবুরের সাথে নূরজাহানের গুপ্ত প্রণয় আছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বহু সাক্ষী নিয়ে এলেন—যারা ঐ দুর্ঘটনার দিন নূরজাহানকে সবুরের পা ধ'রে কাঁদতে দেখেছে! তা ছাড়া সবুর পড়াবার নাম ক'রে নূরজাহানের সাথে মিলবার যথেষ্ট সুযোগ পেত!

নূরজাহান আর আলি নসীব মিঞা একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল। দেশময় ঢি ঢি প'ড়ে গেল। অধিকাংশ লোকেই একথা বিশ্বাস করল।

আলি নসীব মিঞা শত চেষ্টা ক'রেও সবুরকে উকিল দেওয়াবার জন্য রাজী করতে পারলেন না। সে কোর্টে বল্‌লে, সে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবে—উকিল বা সাক্ষী কিছুই দিতে চায় না সে। আলী নসীব মিঞার টাকার লোভে বহু উকিল সাধ্য-সাধনা ক'রেও

সবুরকে টলাতে পারলে না। আলী নসীব মিঞা তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে তাকে জেলে দেখা ক'রে শেষে চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও সফলকাম হয় নি। নূরজাহানের অনুরোধে সে বলেছিল," অনেক ক্ষতিই তোমাদের ক'রে গেলাম—তার উপরে তোমাদের আরো আর্থিক ক্ষতি ক'রে আমার বোঝা ভারী ক'রে তুলতে চাইনে। আমায় ক্ষমা ক'রো নূরজাহান, আমি তোমাদেরে আমার কথা ভুলতে দিতে চাইনে ব'লেই এই দয়াটুকু চাই!

সে সেশনে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক অকপটে ব'লে গেল। জজ সব কথা বিশ্বাস করলেন। জুড়িরা বিশ্বাস করলেন না। সবুর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। আপীল করল না। সকলে বল্‌লে, আপীল করলে সে মুক্তি পাবেই। তার উত্তরে সবুর হেসে বলেছিল যে, সে মুক্তি চায় না—আমীরের যেটুকু রক্ত তার হাতে লেগেছিল—তা ধুয়ে ফেল্‌তে সাতটা বছরেও যদি সে পারে—সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

জজ তার রায়ে লিখেছিলেন, আর কাউকে দণ্ড দিতে এত ব্যথা তিনি পাননি জীবনে।

যেদিন বিচার শেষ হয়ে গেল, সেদিন সপরিবারে আলি নসীব মিঞা ময়মনসিংহে ছিলেন।

নূরজাহান তার বাবাকে সেই দিনই ধরে বস্‌লে—তারা সদলে মক্কা যাবে। আলি নসীব মিঞা বহুদিন থেকে হজ্‌ করতে যাবেন ব'লে মনে

ক'রে রেখেছিলেন, মাঝে মাঝে বল্‌তেনও সে কথা। নানান্ কাজে যাওয়া আর হয়ে উঠেনি, মেয়ের কথায় তিনি যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন! অত্যন্ত খুশী হয়ে ব'লে উঠলেন "ঠিক কইছস বেডি, চল্ আমরা মক্কায় গিয়াই এ সাতটা বছর কাটাইয়া দিই। এ পাপ-পুরীতে আর থাক্‌তাম না! আর আল্লায় যদি বাঁচাইয়া রাহে, ব্যাডা তাল বিল্লিরে কইয়া যাইবাম্, হে যেন একডিবার আমাদের দেখা দিয়া আইয়ে। "বেডা তালাবিল্ল" ব'লেই হো হো করে পাগলের মত হেসে উঠেই—আলি নসিব মিঞা পরক্ষণে শিশুর মত ঢুক্‌রে কেঁদে উঠলেন!

নুরজাহানের মা প্রতিবাদ করলে না। তিনি জানতেন, মেয়ের যা কলঙ্ক রটেছে, তাতে তার বিয়ে তার এ দেশে দেওয়া চল্‌বেনা। আর, এ মিথ্যা বদনামের ভাগী হয়ে এদেশে থাকাও চলে না।

ঠিক হ'ল, একেবারে সব 'ঠিকঠাক ক'রে জমি-জায়গা বিক্রী ক'রে শুধু নগদ টাকা নিয়ে চ'লে যাবেন। আলি নসীব মিঞা সেই দিনই স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে দেখা ক'রে সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে এলেন। কথা হ'ল ব্যাঙ্কই এখন টাকা দিয়ে দেবে পরে তারা সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা তুলে নেবে।

তার পরদিন সকলে জেলে গিয়ে সবুরের সাথে দেখা করলেন। সবুর সব শুন্‌ল। তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। জেলের জামার হাতায় তা মুছে বল্‌লে, "আব্বা, আম্মা, আমি সাত বছর পরে যাইবাম আপনাদের কাছে—কথা দিতাছি।'

তারপর নূরজাহানের দিকে ফিরে বল্‌লে "আল্লায় যদি এই দুনিয়ায় দেখবার না দেয় যে দুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুঁইজ্যা লইবাম।" অশ্রুতে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়ে গেল, আর সে বলতে পারলে না। নূরজাহান কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সবুরের পায়ের ধূলা নিতে গিয়ে তার দু' চোখের দু' ফোঁটা অশ্রু সবুরের পায়ে গড়িয়ে পড়্‌ল! বল্‌ল "তাই দোওয়া কর!"

কারাগারের দুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের মনে হল—তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝিবা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল!

শিউলি-মালা

(১)

মিষ্টার আজ্‌হার কল্‌কাতায় নাম-করা তরুণ ব্যারিষ্টার।

বাট্‌লার, খানসামা, বয়, দারোয়ান, মালি, চাকর-চাকরাণীতে বাড়ী তার হর্দ্দম্‌ সর্‌ গরম।

কিন্তু বাড়ীর আসল শোভাই নাই। মিষ্টার আজ্‌হার অবিবাহিত।

নাম করা ব্যারিষ্টার হ'লেও আজ্‌হার সহজে বেশী কেস্‌ নিতে চায় না। হাজার পীড়াপীড়িতেও না। লোকে বলে, পসার জমাবার এও এক রকম চা্‌ল।

কিন্তু কল্‌কাতার দাবা'ড়েরা জানে, যে, মিষ্টার আজ্‌হারের চাল যদি থাকে—ত সে দাবার চা্‌ল।

দাবা-খেলায় তাকে আজো কেউ হারাতে পারেনি। তার দাবার আড্ডার বন্ধুরা জানে, এই দাবাতেই মিষ্টার আজ্‌হারকে বড় ব্যারিষ্টার হ'তে দেয়নি, কিন্তু বড় মানুষ ক'রে রেখেছে।

বড় ব্যারিষ্টার যখন "উইক্‌লি নোট্‌স্‌" পড়েন, আজ্‌হার তখন অ্যালেখিন ক্যাপাব্লাঙ্কা কিম্বা রুবিন্‌ষ্টাইন্‌, রেটী, মরফির খেলা নিয়ে

ভাবে, কিম্বা চেস্-ম্যাগাজিন্ নিয়ে পড়ে, আর চোখ বুঁজে তাদের চালের কথা ভাবে।

সকালে আর হয় না, বিকেলের দিকে রোজ দাবার আড্ডা বসে। কল্‌কাতার অধিকাংশ বিখ্যাত দাবা'ড়েই সেখানে এসে আড্ডা দেয়, খেলে, খেলা নিয়ে আলোচনা করে।

আজ্‌হারের সব চেয়ে দুঃখ, ক্যাপাব্লাঙ্কার মত খেলোয়াড় কিনা অ্যালেখিনের কাছে হেরে গেল! অথচ এই আলেখিনই বোগোল-জুবোর মত খেলোয়াড়ের কাছে অন্ততঃ পাঁচ পাঁচবার হেরে যায়!

মিষ্টার মুখার্জ্জী অ্যালেখিনের একরোখা ভক্ত। আজও মিষ্টার আজ্‌হার নিত্যকার মত একবার ঐ কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ কর্‌লে, মিষ্টার মুখার্জ্জী ব'লে উঠ্‌লো—"কিন্তু তুই যাই বল আজ্‌হার, অ্যালেখিনের ডিফেন্স্—ওর বুঝি জগতে তুলনা নেই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যালেখিনের কাছে তিন-পাঁচে পনের বার হেরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ার্ল্‌ড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু'চার বাজি সমস্ত ওয়ার্ল্‌ড-চাম্পিয়নই হেরে থাকেন! চব্বিশ দান খেলায় পাঁচ দান জিতেছে। তা ছাড়া, বোগোল-জুবোও ত যে সে খেলোয়াড় নয়।"

আজ্‌হার হেসে ব'লে উঠ্‌ল, "আরে, রাখ তোমার অ্যালেখিন। এইবার ক্যাপাব্ল্যাঙ্কার সাথে আবার খেলা হচ্ছে তার, তখন দেখো একবার অ্যালেখিনের দুর্দ্দশা! আর বোগোল-জুবাকে ত সেদিনও ইটালিয়ান মণ্টিসেলি বগল-দাবা করে দিলে! হাঁ, খেলে বটে গ্রান্‌ফেল্ড!

বন্ধুদের মধ্যে একজন চ'টে গিয়ে বল্‌লে, "তোমাদের কি ছাই আর কোনো কম্ম নেই ? কোথাকার বগলঝুপো না ছাইমুণ্ডু, অ্যালেখিন না ঘোড়ার ডিম—জ্বালালে বাবা।"

মুখার্জ্জী হেসে বল্‌লে, "তুমি ত বেশ গ্রাবু খেল্‌তে পার অজিত, এমন মাহ ভাদর, চ'লে যাওনা স্ত্রীর বোনেদের বাড়ীতে ! এ দাবার চাল তোমায় মাথায় ঢুক্‌বে না !"

তরুণ উকিল নামিজ হাঁই তু'লে তুড়ি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ও জিনিস মাথায় না ঢুকাতে বেঁচে গেছি বাবা ! তার চেয়ে আজ্‌হার সাহেব দুটো গান শোনান, আমরা শুনে যে যার ঘরে চলে যাই। তারপর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে ব'স !"

দাবাড়ে দলের আপত্তি টিক্‌ল না। আজ্‌হারকে গাইতে হ'ল। আজ-হার চমৎকার ঠুংরী গায়। বিশুদ্ধ লক্ষ্ণৌ-ঢংএর অজস্র ঠুংরী গান তার জানা ছিল। এবং তা এমন দরদ দিয়ে গাইত সে, যে শুন্‌ত, সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু সে কেবলি গজল গাইতে লাগল।

আজ্‌হার অন্য সময় সহজে গজল গাইতে চাইত না।

মুখার্জ্জী হেসে ব'লে উঠল—"আজ তোমার প্রাণে বিরহ উথলে উঠল নাকি হে ? কেবল গজল গাচ্ছ, মানে কি ? রংটং ধ'রেছে নাকি কোথাও ?

আজ্‌হারও হেসে বল্‌ল, "বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ !"

এতক্ষণে যেন সকলের বাইরের দিকে নজর পড়্‌ল। একটু আগের বর্ষা-ধোওয়া ছল্‌ছ'লে আকাশ। যেন একটী বিরাট নীল

পদ্ম। তারির মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোক-ভ্রমর।

লেক-রোডের পাশে ছবির মত বাড়ীটী।

শিউলির সাথে রজনীগন্ধার গন্ধ-মেশা হাওয়া মাঝে মাঝে হলঘরটাকে উদাস-মদির ক'রে তুলছিল!

সকলেরি চোখ মন দু-ই যেন জুড়িয়ে গেল!

নাজিম সোজা হয়ে বসে বল্‌ল, "ওই দাবার গুঠি নিয়ে বস্‌লে কি আর এসব চোখে পড়ত?

আজ্‌হার দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল "সত্যিই তাই!"

মুখাৰ্জ্জী ব'লে উঠল, "নাঃ, এ শালার শিউলির ফুল আজ দাবা খেল্‌তে দেবেনা দেখছি!"

আজ্‌হার বিস্মিত হয়ে ব'লে উঠল, "তোমারও শিউলি! ফুলের সঙ্গে কোনো-কিছু জড়িত আছে নাকি হে?"

তার কিছু বল্‌বার আগেই অজিত ব'লে উঠল, "আরে ছোঃ! দাবাড়ের আবার রোমান্স! বেচারার জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে! নিজের স্ত্রীর প্রেমে পড়া! রাম বল! তাও—সে স্ত্রী চ'লে গেছেন বাপের বাড়ী—ঐ দাবার জ্বালায়! ওর আবার শিউলি ফুল!"

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল। মুখাৰ্জ্জী চ'টে গিয়ে ব'লে উঠ্‌ল "তুই থাম অজিত! পাগলের মত যা তা বক্‌লেই তাকে রসিকতা বলেনা!"

অজিত মুখ চুণ করায় ভান করে বলে উঠল, "আমি ত রসিকতা করিনি দাদা। তুমি সত্যসত্যই তোমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছ—দশজনে বদনাম দেয়, তাই আমিও বল্‌লাম। ওঁরা যদি তা শুনে হাসেন, তাতে আমার কি দোষ হ'ল?"

আজ্‌হার হেসে ব'লে উঠল, "এ কি তোমার অন্যায় অপবাদ অজিত? স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দাবাড়ের কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে না, এ তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

অজিত বল্‌লে, "প্রথম মিষ্টার মুখার্জ্জী, তারপর তোমাকে দেখে!"

অজ্‌হার বলে উঠল, "আরে, আমি যে বিয়েই করিনি।"

অজিত ব'লে উঠল "তার মানে, তোমার অবস্থা আরো শোচনীয়। ও বেচারা তবু অন্ততঃ স্ত্রীর সঙ্গে লভে পড়ল, তোমার আবার স্ত্রীই জুট্‌ল না!"

নাজিম টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ব্রাভো! বেঁচে থাকুন অজিত বাবু! এইবার জোর বলেছেন!"

এমন সময় মালি শিউলিফুলের একজোড়া চমৎকার গো'ড়ে মালা টেবিলের উপরে রেখে চ'লে গেল। অজিত গম্ভীর ভাবে মালা দুটী ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখতেই সকলে হেসে উঠল। অজিত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিনয় করার সুরে ব'লে উঠল, "হে ব্র্যাকেট-সুন্দরী। আজি এই শুক্লা শারদীয়া নিশেতে এই সে'উতি মালার—"

আজ্‌হার ম্লান হাসি হেসে বাধা দিয়ে বল্‌ল, "দোহাই

অজিত ! ও মালা নিয়ে বিদ্রূপ করিস্‌নে ভাই ! ও মালা আমার নয় !"

অজিত না-ছোড় বান্দা ! তার বিস্ময়কে চাপা দিয়ে সে ব'লে উঠল, "তবে এ মালা কার বন্ধু ? থুড়ি—কার উদ্দেশে বন্ধু ?"

নাজিম ব'লে উঠল, "দেখ, দাবাড়ের নাকি রোম্যান্স, নেই ?"

আজ্‌হার ব'লে উঠল, "আমি প্রতি বছর এমনি পয়লা আশ্বিন শিউলিফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দেই। এ-মালা জলের—অন্য কারুর নয়।" মুখে বিষাদ-মাখা হাসি।

মায় দাবাড়ের দল পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উ'ঠে বস্‌ল। অজিত বয়কে হাঁক দিয়ে চা আন্‌তে বলে ভাল করে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ব'সে আজ্‌হারের দিকে চেয়ারটা ফিরিয়ে বলে উঠল. 'তারপর, বলত বন্ধু, ব্যাপারটা কি ! সঙীন নিশ্চয়ই ! পয়লা আশ্বিন—প্রতি বছর—শিউলিমালা—জলে ভাসিয়ে দেওয়া ! চমৎকার গল্প হবে ! ব'লে ফেল। নৈলে এইখানে সকলে মিলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দেবো !"

সকলে হেসে উঠল, কিন্তু সায় দিল সকলে অজিতের প্রস্তাবে।

অনেক পীড়াপীড়ির পর আজ্‌হার হেসে ব'লে উঠল, "কিন্তু তারও আরম্ভ যে দাবা খেলা দিয়ে !"

অজিত লাফিয়ে ব'লে উঠল, "তা হোক ! ও পল্‌তার সুক্তো খেয়ে ফেলা যাবে কোনো রকমে, শেষের দিকে দই-সন্দেশ পাব !"

মুখার্জ্জী ব'লে উঠল, "এ দাবা খেলায় নৌকোর কিস্তিই বেশী থাকবে হে ! গজ ঘোড়া সব কাটাকাটি হয়ে যাবে ! ভয় নেই !"

(২)

সকলের আর এক প্রস্থ চা খাওয়া হ'লে পর সিগার ধরিয়া মিনিট খানিক ধুম্র উদ্‌গীরণ ক'রে আজ্‌হার বল্‌তে লাগল।—

তখন সবে মাত্র ব্যারিষ্টারী পাস ক'রে এসেই শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্র মাস। তখনো পূজার ছুটীওয়ালার দল এসে ভিড় জমায়নি। তবে আগে থেকেই দু একজন ক'রে আসতে সুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড্ডো বেশী ঝোঁক ছিল। ও ঝোঁক বিলেতে গিয়ে আরো বেশী করে চাপল। সেখানে ইয়েট্‌স্‌, মিচেল, উইণ্টার, টমাস প্রভৃতি সকল নাম-করা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি এবং কেম্ব্রিজের হয়ে অনেক গুলো খেলা জিতেওছি। শিলং গিয়ে খুঁজতেই দু একজন দাবাখেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। তবে তারা কেউ বড় খেলোয়াড় নয়। তারা আমার কাছে ক্রমাগত হার্‌ত। এক দিন ওরির মধ্যে একজন ব'লে উঠল, "একজন বুড়ো রিটায়ার্ড্‌ প্রফেসর আছেন এখানে, তিনি মস্ত বড় দাবাড়ে, শোনা যায়—তাঁকে কেউ হারাতে পারে না—যাবেন খেল্‌তে তাঁর সাথে?"

আমি তখনি উ'ঠে প'ড়ে বল্‌লাম, "এখনই যাব, চলুন। কোথায় তিনি?"

সে ভদ্রলোকটী বল্‌লেন, "চলুন না, নিয়ে যাচ্ছি! আপনার মত খেলোয়াড় পেলে তিনি বড় খুশী হবেন। তাঁরও আপনার মতই দাবা-খেলার নেশা! অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই!"

আমি ইউরোপে অনেকেরই "ব্লাইণ্ড্ ফোল্ডেড্" খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে! আকাশে এক ফালি চাঁদ, বোধ হয় শুক্লপঞ্চমীর। যেন নতুন আশার ইঙ্গিত। সারা আকাশে যেন সাদামেঘের তরণীর বাইচ্-খেলা সুরু হয়েছ। চাঁদ আর তারা তার মাঝে যেন হাবুডুবু খেয়ে একবার ভাস্‌ছে, একবার উঠছে।

ইউকালিপ্‌টাস্ আর দেওদারু তরু ঘেরা একটী রঙীন্ বাঙ্‌লোয় গিয়ে আমরা উঠতেই দেখি, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস এক শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটী তরুণীর সঙ্গে দাবা খেল্‌ছেন।

আমাদের দেশের মেয়েরাও দাবা খেলেন, এই প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তরুণীর দিকে তাকাতেই তরুণীটী উঠে প'ড়ে, বল্‌লে "বাবা, দেখ ক'রা এসেছেন!"

খেলাটা শেষ না হ'তেই মেয়ে উ'ঠে পড়াতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হাসিমুখে উ'ঠে বল্‌লেন, "আরে, বিনয় বাবু যে! এঁরা কারা? এস, বস। এঁদের পরিচয়—"

বিনয় বাবু—যিনি আমায় নিয়ে গেছলেন, আমার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ লাফিয়ে উ'ঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলেন, "আপনিই—এই তুমিই আজহার? আরে, তোমার নাম যে চেস-ম্যাগাজিনে, কাগজে অনেক দেখেছি। তুমি যে মস্ত বড় খেলোয়াড়! ইয়েট্সের সঙ্গে বাজি চটিয়েছ, একি কম কথা! এইত তোমার বয়েস!—বড় খুশী হলুম—বড় খুশী হলুম!...ওমা শিউলি, একজন মস্ত বড় দাবা'ড়ে এসেছেন! দেখে যাও! বাঃ বড় আনন্দে কাটবে তা হ'লে! এই বয়সেও আমার বড্ডো দাবা-খেলার ঝোঁক, কি করি, কাউকে না পেয়ে মেয়ের সাথেই খেল্‌ছিলুম!" বলেই হো হো ক'রে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে শান্ত সন্ধ্যাকে মুখরিত ক'রে তুল্‌লেন।

শিউলি নমস্কার ক'রে নীরবে তার বাবার পাশে এসে বসল্। তাকে দেখে আমার মনে হ'ল, এ-যেন সত্যই শরতের শিউলি।

গায় গোধূলি রং-এর শাড়ীর মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখখানি—হলুদ-রং বোঁটায় শুভ্র শিউলিফুলের মতই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়ত একটু বেশীই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙ্‌ল।

বৃদ্ধ যেন খেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়্‌ছিলেন। চাকর চায়ের সরঞ্জাম এনে দিতেই শিউলি চা তৈরী করতে করতে হেসে ব'লে উঠল, "বাবার বুঝি আর দেরী সইছে না?" ব'লেই আমার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল, "কিছু মনে করবেন না! বাবা বড্ডো দাবা

খেল্‌তে ভাল বাসেন! দাবা খেল্‌তে না পেলেই ওঁর অসুখ হয়।" ব'লেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "এইবার চা খেতে খেতে খেলা আরম্ভ করুন, আমরা দেখি।"

বিনয় হেসে বল্‌ল, "হাঁ, এইবার সামনে সামনে লড়াই। বুঝ্‌লে মিস চৌধুরী, আমাদের রোজ উনি হারিয়ে ভূত ক'রে দেন!"

খেলা আরম্ভ হ'ল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল কেউ কেউ উপর-চালও দিতে লাগল। মিস চৌধুরী ওর্ফে শিউলি তার বাবার যা দু' একটি ত্রুটী ধরিয়ে দিলে, তাতে বুঝলাম—এও এর বাবার মতই ভাল খেলোয়াড়।

কিছুক্ষণ খেলার পর বুঝলাম, আমি ইউরোপে যাদের সঙ্গে খেলেছি—তাঁদের অনেকের চেয়েই বড় খেলোয়াড় প্রফেসর চৌধুরী। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে জান্‌তাম বড় কেমিষ্ট্‌ ব'লে, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত ভাল দাবা খেল্‌তে পারেন, এ আমি জান্‌তাম না।

আমি একটা বেশী বল কেটে নিতেই বৃদ্ধ আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ ক'রে ডিফেন্সিভ্‌ খেলা খেল্‌তে লাগলেন। তিনি আমার গজের খেলার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। শিউলি বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু একটা বল কম নিয়েও বৃদ্ধ এমন ভাল খেল্‌তে লাগলেন যে, আমি পাছে হেরে যাই এই ভয়ে খেলাটা ড্র ক'রে দিলাম। বৃদ্ধ বারংবার আমার প্রশংসা করতে করতে বল্‌লেন, "দেখলি মা

শিউলি, আমাদের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস, গজ ঘোড়ার মত খেলে না। দেখলি জোড়া গজে কি খেললে! বড় ভাল খেল বাবা তুমি! আমি হারি কিম্বা হারাই, ড্র সহজে হয় না!"

শিউলি হেসে বল্‌লে, "কিন্তু তুমি হারনি কত বৎসর বল ত বাবা!"

প্রফেসর চৌধুরী হেসে বল্‌লেন, "না মা হেরেছি। সে আজ প্রায় পনর বছর হ'ল, একজন পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক—আধুনিক শিক্ষিত নন—আমায় হারিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ওঃ ওরকম খেলোয়াড় আর দেখিনি!"

আবার খেলা আরম্ভ হ'তেই বিনয় হেসে ব'লে উঠল, "এইবার মিস চৌধুরী খেলুন না মিষ্টার আজহারের সাথে!"

বৃদ্ধ খুশী হয়ে বল্‌লেন, "বেশ ত! তুই-ই খেল্ মা, আমি একবার দেখি।"

শিউলি লজ্জিত হয়ে ব'লে উঠল, "আমি কি ওঁর সঙ্গে খেল্‌তে পারি?"

কিন্তু সকলের অনুরোধে সে খেল্‌তে বস্‌ল। মাঝে চেস-বোর্ড্ একধারে চেয়ারে শিউলি—একধারে আমি! তার কেশের গন্ধ আমার মস্তিষ্ককে মদির ক'রে তুল্‌ছিল! আমার দেহে মনে যেন নেশা ধ'রে আসছিল! আমি দু' একটা ভুল চা'ল দিতেই শিউলি আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নত ক'রে ফেল্‌লে। মনে হ'ল, তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে হাসি যেন অর্থ-পূর্ণ।

আবার ভুল করতেই আমি চাপায় প'ড়ে আমার একটা নৌকা হারালাম। বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনয় বাবুর দল হেসে ব'লে উঠলেন—"এইবার মিষ্টার আজহার মাত হবেন।" মনে হ'ল, এ হাসিতে বিদ্রূপ লুকানো আছে।

আমি এইবার সংযত হয়ে মন দিয়ে খেল্‌তে লাগলাম। দুই গজ ও মন্ত্রী দিয়ে এবং নিজের কোটের বো'ড়ে এগিয়ে এমন অফেন্সিভ্‌ খেলা খেল্‌তে শুরু ক'রে দিলাম যে, প্রফেসর চৌধুরীও আর এ-খেলা বাঁচাতে পারলেন না। শিউলি হেরে গেল! সে হেরে গেলেও এত ভাল খেলেছিল, যে, আমি তার প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পারলাম না। আমি বল্‌লাম—"দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্লড্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌ মিস মেন্‌চিকের সাথেও খেলেছি, কিন্তু এত বেশী বেগ পেতে হয়নি আমাকে। আমি ত প্রায় হেরেই গেছিলাম!

দেখলাম, আনন্দে লজ্জায় শিউলি কমলফুলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে! আমি বেঁচে গেলাম। সে যে হেরে গিয়ে আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়নি—এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করলাম।

প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে আবার খেলা হ'ল, এবারও ড্র হয়ে গেল।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে! বল্‌লেন, "হ্যাঁ, এতদিন পরে একজন খেলোয়াড় পেলুম, যার সঙ্গে খেল্‌তে হ'লে অন্ততঃ আঠ চা'ল ভেবে খেল্‌তে হয়!"

কথা হ'ল, এরপর রোজ প্রফেসর চৌধুরীর বাসায় দাবার আড্ডা বসবে।

উঠবার সময় হঠাৎ বৃদ্ধ ব'লে উঠলেন, "মা শিউলি, এতক্ষণ খেলে মিষ্টার আজহারের নিশ্চয়ই বড্ডো কষ্ট হয়েছে, ওঁকে একটু গান শোনাও না!" আমি ততক্ষণ ব'সে পড়ে বল্লাম, "বাঃ, এ খবর ত জান্‌তাম না।"

শিউলি কুণ্ঠিতস্বরে ব'লে উঠল, "এই শিখ্‌ছি কিছুদিন থেকে, এখনো ভাল গাইতে জানিনে!"

শিউলির আপত্তি আমাদের প্রতিবাদে টিক্‌ল না। সে গান করতে লাগল।

সে গান যারই লেখা হোক—আমার মনে হতে ল'াগল—এর ভাষা যেন শিউলিরই প্রাণের ভাষা—তারই বেদনা নিবেদন।

এক একজনের কণ্ঠ আছে—যা শুনে এ কণ্ঠ ভাল কি মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ ক'রে দেয়! সে কণ্ঠ এমন দরদে ভরা—এমন অকৃত্রিম, যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। ভালমন্দ বিচারের বহু উর্দ্ধে সে কণ্ঠ, কোনো কর্ত্তব্য নেই, সুর নিয়ে কোনো কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, অথচ হৃদয়কে স্পর্শ করে। এর প্রশংসাবাণী উথ্‌লে ওঠে মুখে নয়—চোখে!

এ সেই কণ্ঠ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র বল্‌তে গেলাম, "অপূর্ব্ব!" গলায় স্বর বেরুল না। শিউলির চোখে পড়ল—আমার চোখের

জল। সে তার দীর্ঘায়ত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল!

হায়, সে যদি জান্‌ত—কালির লেখা মু'ছে যায়, জলের লেখা মোছে না!

সেদিন আমায় নিয়ে কে কি ভেবেছিল—তা নিয়ে সেদিনও ভাবিনি, আজও ভাবি না। ভাবি—শিউলিফুল যদি গান গাইতে পারত, সে বুঝি এম্‌নি ক'রেই গান গাইত। গলায় তার এমনি দরদ, সুরে তার এমনি আবেগ!

সুরের যেটুকু কাজ সে দেখাল, তা ঠুংরী ও টপ্পা মেশানো। কিন্তু বুঝলাম, এ তার ঠিক শেখা নয়—গলার ও কাজটুকু স্বতঃস্ফূর্ত্ত! কমল যেমন না জেনেই তার গন্ধ-পরাগ ঘিরে শতদলের সুচারু সমাবেশ করে—এও যেন তেম্‌নি।

গানের শেষে ব'লে উঠলাম, "আপনি যদি ঠুংরী শেখেন, আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী হতে পারেন! কি অপূর্ব্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর!"

শিউলিফুলের শাখায় চাঁদের আলো পড়লে তা যেমন শোভা ধারণ করে, আনন্দ ও লজ্জা মিশে শিউলিকে তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শিউলি তার লজ্জাকে অতিক্রম ক'রে ব'লে উঠল, "না না আমার গলা একটু ভাঙা। সে যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনি গান জানেন। জানেন যদি, গান্‌না একটা গান!"

আমি একটু মুশ্‌কিলে পড়লাম। ভাবলাম, 'না' বলি। আবার

গান শুনে গলাটাও গাইবার জন্য সুড়সুড় করছে! বল্‌লাম, 'আমি ঠিক গাইয়ে নই, সমঝদার মাত্র! আর, যা গান জানি, তাও হিন্দি।"

প্রফেসর চৌধুরী খুশী হয়ে ব'লে উঠলেন, "আহা হা হা! বল্‌তে হয় আগে থেকে! তাহ'লে যে গানটাই আগে শুন্‌তাম তোমার। আর গান হিন্দি ভাষায় না হ'লে জমেই না ছাই। ও ভাষাটাই যেন গানের ভাষা। দেখ, ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হ'তেই পারে না। কীর্ত্তন, বাউল আর রামপ্রসাদী ছাড়া এ ভাষায় অন্য ঢংএর গান চলে না।' আমি বল্‌লাম, "আমি যদিও বাঙলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না।"

গান করলাম। প্রফেসর চৌধুরী ত ধরে বসলেন, তাঁকে গান শেখাতে হবে কা'ল থেকে! শিউলির দুই চোখে প্রশংসার দীপ্তি ঝলমল করছিল।

বিনয় বাবুর দলও ওস্তাদী গানেরই পক্ষপাতী দেখলাম। তাদের অনুরোধে দু' চারখানা খেয়াল ও টপপা গাইলাম। প্রফেসর চৌধুরীর সাধুবাদের আতিশয্যে আমার গানের অর্দ্ধেক শোনাই গেল না। শেষের দিকে ঠুংরীই গাইলাম বেশী।

গানের শেষে দেখি, আমাদের পিছন দিকে আরো কয়েকটী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। শিউলি পরিচয় ক'রে দিল—"ইনি আমার মা—ইনি মামিমা—এরা আমার ছোট বোন।"

তার পরের দিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'লাম।

ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ! চোখ জ্বা'লা করে উঠল। মনে হ'ল, চোখে এক কণা বালি পড়লেই যদি চোখ এত জ্বালা করে—চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে!

(৩)

দেড় মাস ছিলাম শিলং-এ। হপ্তা খানেকের পরেই আমাকে হোটেল ছেড়ে প্রফেসার চৌধুরীর বাড়ী থাক্‌তে হয়েছিল গিয়ে। সেখানে আমার দিন-রাত্রি নদীর জলের মত বয়ে যেতে লাগলো। কাজের মধ্যে দাবা খেলা আর গান।

মুশকিলে পড়লাম—প্রফেসর চৌধুরীকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দাবাখেলা ত আছেই—তাঁকে গান শেখানোই হয়ে উঠল আমার পক্ষে সব চেয়ে দুষ্কর কার্য্য।

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার তান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল।

মনে হ'ল, আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত ক'রে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিময় হ'লনা—হবেও না এ জীবনে কোনোদিন—কিন্তু কণ্ঠ বদল হয়ে গেল! আর মনের কথা—সে শুধু মনই জানে!

অজিত বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, "কণ্ঠ বদল না কণ্ঠী বদল বাবা? শেষটা নেড়ানেড়ীর প্রেম? ছোঃ!"

আজহার কিছু না ব'লে আবার সিগার ধরিয়ে ব'লে যেতে লাগল।—

একদিন ভোরে শিউলির কণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেল। সে গাচ্ছিল—

"এখন আমার সময় হ'ল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।"

গান শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হ'ল—আমার বুকের সকল পাঁজর জুড়ে ব্যথা। চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। চোখে জল ভ'রে এল।

আশাবরী সুরের কোমল গান্ধারে আর ধৈবতে যেন তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা গড়িয়ে পড়েছিল! আজ প্রথম শিউলির কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আভাস পেলাম।

ঠং ক'রে কিসের শব্দ হ'তেই ফিরে দেখি, শিউলি তার দুটী কর-পল্লব ভরে শিউলি ফুলের অঞ্জলি নিয়ে পূজারিণীর মত আমার টেবিলের উপর রাখছে। চোখে তার জল।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার অশ্রু লুকাবার কোনো ছলনা না ক'রে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি কালই যাচ্ছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে হৃদয়াবেগ সংযত ক'রে আস্তে বল্‌লাম—"হাঁ ভাই!" আরো যেন কি বল্‌তে চাইলাম। কিন্তু কি বল্‌তে চাই ভুলে গেলাম।

শিউলি, শিউলি ফুলগুলিকে মুঠোয় তুলে অন্যমনস্কভাবে অধরে কপোলে ছুঁইয়ে বল্‌লে, "আবার কবে আসবেন?"

আমি ম্লান হাসি হেসে বললাম, "তা ও জানিনে ভাই! হয়ত আসব!"

শিউলি ফুলগুলি রেখে চ'লে গেল। আর একটী কথাও জিজ্ঞাসা করল না।

আমার সমস্ত মন যেন আর্ত্তস্বরে কেঁদে উঠল—ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এই এক মুহূর্ত্তের জন্যই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি জীবনে তোর দ্বিতীয় বার এ শুভ মুহূর্ত্ত আর আসবে না, আসবে না!

এক মাস ওদের বাড়ীতে ছিলাম। কত স্নেহ, কত যত্ন, কত আদর। অবাধ মেলা-মেশা—সেখানে কোনো নিষেধ, কোনো গ্লানি, কোনো বাধাবিঘ্ন, কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এ সব ছিল না ব'লেই বুঝি এতদিন [illegible] এক কাছে থেকেও কারুর করে করস্পর্শ-টুকুও লাগেনি কোনোদিন। এই মুক্তিই ছিল বুঝি আমাদের সব চেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কেউ কারুর মন যাচাই করিনি। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথাও উদয় হয়নি মনে। একজন অসীম আকাশ—একজন অতল সাগর। কোনো কথা নেই—প্রশ্ন নেই, শুধু এ ওর চোখে, ও এর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে।

কেউ নিষেধ করলে না, কেউ এসে পথ আগলে দাঁড়াল না! সেও যেন জানে—আমাকে চ'লে আসতেই হবে, আমিও যেন জানি—আমাকে যেতেই হবে।

নদীর স্রোতই যেন সত্য—অসহায় দুই কূল এ ওর পানে

তাকিয়ে আছে। অভিলাষ নাই—আছে শুধু অসহায় অশ্রু-চোখে চেয়ে থাকা।

সে চ'লে গেলে টেবিলের শিউলি ফুলের অঞ্জলি দুই হাতে তুলে মুখে ঠেকাতে গেলাম। বুঝি বা আমারও অজানিতে আমি সে ফুল ললাটে ঠেকিয়ে আবার টেবিলে রাখলাম। মনে হ'ল, এ ফুল পূজারিণীর—প্রিয়ার নয়! ভাবতেই বুক যেন অব্যক্ত বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল।

চোখ তুলেই দেখি, নিত্যকার মতই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শিউলি বল্ছে—"আজ আর গান শেখাবেন না?"

আমি বল্লাম—"চল, আজই ত শেষ নয়!"

শিউলি তার হরিণ চোখ তু'লে আমার পানে চেয়ে রইল। ভয় হ'ল ব'লে তার মানে বুঝবার চেষ্টা করলাম না।

ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন [illegible] ভোরের হাওয়া—যত ভালবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধূলায় ঝ'রে পড়বে!

এ যেন পরীর দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে!

এ যেন মায়া-মৃগ—ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে!

গান শেখালাম—বিদায়ের গান নয়। বিদায়ের ছাড়া আর সব-কিছুর গান। বিদায় বেলা ত আসবেই—তবে ওর কথা ব'লে ওর সব বেদনা সব মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করি কেন?

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল নিষ্কলঙ্ক—নির্মেঘ—নিরাভরণ। আমি

প্রফেসার চৌধুরীকে বল্লাম—আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য্য ভাল মানুষ সেজেছে ত! কোনো বেশভূষা নেই!

বল্‌তেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসার চৌধুরী ব'লে উঠলেন—"সন্ধ্যা আজ বিধবা হয়েছে!"

এক একটী কথায় ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম! এই শান্ত সৌম্য মানুষটীর বুকেও কি ঝড় উঠেছে বুঝলাম। মনে মনে বল্লাম—তুমি অটল পাহাড়, তোমার পায়ের তলায় বসে শুধু ধ্যান করতে হয়! তোমাকে ত ঝড় স্পর্শ করতে পারে না!

বৃদ্ধ বুদ্ধি মন দিয়ে আমার মনের কথা শুনেছিলেন। ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন—"আমি অতি ক্ষুদ্র, বাবা! পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ! তবু তোমাদের শ্রদ্ধা দেখে গিরিরাজ হ'তেই ইচ্ছা করে।"

আমি কিছু [illegible] বার আগেই শিউলি আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"এই যে সন্ধ্যা দেবী!" বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল সেদিন টকটকে লাল রংএর শাড়ী। ওকে লাল শাড়ী পরতে আর কোনদিন দেখিনি। মনে হ'ল, সারা আকাশকে বঞ্চিত ক'রে সন্ধ্যা আজ মূর্ত্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে রক্ত-ধারা রংএর শাড়ী, তার মনে রক্ত-ধারা,—মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া! চোখ যেমন পুড়িয়ে গেল, তেমনি মনে পূরবীর বাঁশী বেজে উঠল।

শিউলির কাছে দু-একটা বাঙলা গান শিখেছিলাম। আমি বল্লাম —"একটা গান গাইব ?" শিউলি আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর ব'সে পড়ে বল্ল—"গান !"

আমি গাইলাম—

"বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এল
সোনার গগন রে !"

প্রফেসার চৌধরী উ'ঠে গেলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন, "বাবাজী, আজ একবার শেষবার দাবা খেল্‌তে হবে !"

চৌধুরী সাহেব উঠে যেতে আমি বল্‌লাম—"আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন এম্‌নি আশ্বিন মাস—এম্‌নি সন্ধ্যা আসবে—তখন কি কর্‌ব বল্‌তে পার ?"

শিউলি তার দু চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় ক'রে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল—"শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও !'

আমি নীরবে সায় দিলাম—তাই হবে ! জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি করবে ?" সে হেসে বললে, আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে !'

আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকচিক ক'রে উঠল।

রাত্রে দাবা খেলার আড্ডা বসল। প্রফেসর চৌধুরী আমার কাছে হেরে গেলেন। আমি শিউলির কাছে হেরে গেলাম ! জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ হার ! আর সেই হারই আমার গলার হার হয়ে রইল !

সকালে যখন বিদায় নিলাম—তখন তাদের বাঙলোর চার পাশে উইলো-তরু তুষারে ঢাকা পড়েছে!

আর তার সাথে দেখা হয়নি—হবেও না। একটু হাত বাড়ালেই হয়ত তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলিফুল—বড় মৃদু, বড় ভীরু, গলায় পর্‌লে দু দণ্ডে আঁউরে, যায়! তাই শিউলি-ফুলের আশ্বিন যখন আসে—তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই!